দ্বিতীয় অধ্যায়

মনসামঙ্গল পরিক্রমা

ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পাঁচশ বছর ধরে মনসামঙ্গল কাব্যের বিস্তার। কানা হরিদত্ত থেকে আরম্ভ করে নারায়ণদেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজবংশী দাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, ষষ্ঠীবর দত্ত, জীবন মৈত্র, বিষ্ণু পাল প্রভৃতি অসংখ্য কবি এই কাব্য সৃষ্টিতে হাত লাগিয়েছেন। এবং প্রায় সব কবির কাব্যেই কাহিনীর মূলকাঠামো, মূলকথাবস্তু রক্ষিত হয়েছে। তথাপি একটু সন্ধানী দৃষ্টি বিভিন্ন কবি রচিত কাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের সন্ধান পায়। আজকের মতো মধ্যযুগের মানুষের চিন্তা প্রকৃতি এত বিচিত্র ছিল না। আধুনিক কালের কবিদের মতো চিন্তার ব্যাপ্তি সেকালে ছিল না। কাহিনীর দ্রুতগতির প্রচার সে যুগে সম্ভব হয় নি। তবু কাহিনীর মূলগত বৈশিষ্ট্য রক্ষার পাশাপাশি মনসামঙ্গলের কাব্যের কবিরা কাহিনীর মধ্যে যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন তা বিশ্লেষণের যোগ্য।

মধ্যযুগে কাব্যের প্রচারে গায়েনের এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তাঁরা যখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মঙ্গলগান করতে যেতেন তখন সেই অঞ্চলে এই কাব্যের কাহিনী প্রসার লাভ করত। কবিরা যেমন নিজ নিজ অঞ্চলের লৌকিক বিষয়কে এই কাব্যের মধ্যে গেঁথে দিতেন তেমনি গায়েনরাও নিজেদের আহৃত গল্পকাহিনী এতে ঢুকিয়ে দিতেন। কখনো আবার প্রচলিত লোক-কাহিনীকেও কাব্যের অঙ্গীভূত করে নিতেন। এতে মানুষের গল্প ও গান শোনার স্পৃহা যেমন জাগত তেমনি কাহিনীতে বৈচিত্র্যও সৃষ্টি হতো। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আঞ্চলিক বিষয়গুলি যেখানে কাব্যে স্থান পেয়েছে সেখানে তা বৈচিত্র্যের কারণ হয়েছে। মনসা কথায় গায়েন দ্বারা যে সব ঘটনা কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছে সেইসব ঘটনা যেমন গায়েনদের ব্যক্তিগত অভিরুচি দ্বারা সজ্জিত হয়েছে তেমনি তার শিকড় তৎকালীন আঞ্চলিক সমাজ পরিবেশের মধ্যেও নিহিত আছে।

'মনসামঙ্গল' কাব্যের দুটি খন্ড - দেবখন্ড ও মানবখন্ড। 'দেবখন্ডে'র কাহিনীতে সৃষ্টিপত্তন, সমুদ্রমন্থন, বিভিন্ন পৌরাণিক বৃত্তান্ত ইত্যাদি বর্ণনার পাশাপাশি কবিরা বাংলার সামাজিক পরিমন্ডলটিকে ভুলে যান নি। কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন কি দেবখন্ডের কাহিনীর মধ্যেও বাঙ্গালীর সমাজজীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ লাভ করেছে। শিবের পারিবারিক কলহ, কামলোলুপতা, এক নৈতিক উদাসীনতায় মনসার জন্ম দেওয়া, মনসার জন্ম কাহিনীর বৈচিত্র্য, জন্মের পর থেকে মনসাকে শিব ও গৌরীর অবহেলা ইত্যাদি কাহিনীর মধ্যে সমাজ মানসের প্রতিফলন হয়েছে বলে মনে করি। মনসা জন্ম থেকেই লাঞ্ছিতা।

তিনি দেবী। মানুষের সংসারে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য তাঁর সংগ্রাম। কাব্যের মধ্যে তাঁর মতো লাঞ্ছনা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীকে ভোগ করতে হয় নি। মনসার এই দুঃখের পরিচয় আরো করুণ হয়ে ওঠে স্বামী জগৎকারু যখন তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যান, সেই সময় তাঁর করুণ আর্তি পাঠকের মনকেও ভারাক্রান্ত করে তোলে। মনসাকে আর তখন দেবী বলে মনে হয় না। মনে হয় মনসা বাংলাদেশের স্বামী পরিত্যক্তা অসহায়া কোনও এক রমণী যিনি পিতার সংসারে বিমাতা কর্তৃক লাঞ্ছিতা, শ্বশুর বাড়ীতে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা, এমন কি সমাজে স্বীকৃতিলাভে বঞ্চিতা। বস্তুত মানুষের সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি চাঁদের উপর যে অত্যাচার করেছেন তার মূলে এই ব্যক্তিগত জীবনের লাঞ্ছনা ও পীড়নের ইতিহাস থাকা সম্ভব।

'মানবখন্ডে' সর্বপ্রথম দুই বিরোধী শক্তির সংগ্রাম লক্ষ্য করা যায়। যদিও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে এমন কি সমসাময়িক কালে রচিত অনুবাদ সাহিত্য রামায়ণে দুই সত্তার বিরোধের কাহিনী আছে তবে সে বিরোধ ও চন্দ্রধরের বিরোধের মধ্যে তফাৎ আছে। চন্দ্রধর একটি সত্যকে আঁকড়ে ধরে দেবীর সমস্তরকম অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছেন। এতে তাঁর জীবন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও তাঁর মধ্যে আপোষ রফার প্রশ্ন ওঠে নি। তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলা সমাজদেহের যুগদ্বন্দ্বের পরিচয়টি চাঁদ মনসার দ্বন্দ্বে ব্যক্ত হওয়াও সম্ভব। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে (চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল) দেবতা ও মানুষের সংঘাত থাকলেও যুগের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বটি মনসামঙ্গলের মতো অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে পরিস্ফুট হয় নি। মঙ্গলকাব্য ধারার প্রাচীনতম কাব্য হিসেবে মনসামঙ্গলেই এর যথার্থ উৎসার ঘটেছে। মনসা মঙ্গলকাব্যের চাঁদ মনসার কাহিনী মনসা কবিদের পরিচয় বহন করে। নিজস্ব আদর্শ রক্ষায় দৃঢ় চাঁদ সদাগর তৎকালীন সমাজের স্থির আদর্শে বিশ্বাসী মানুষেরই প্রতীক।

চাঁদ ও মনসার পরিণামহীন দ্বন্দ্বের কাহিনীকে বেহুলা একটি পরিণতি দিয়েছে। বেহুলা শুধু মনসামঙ্গলে কাব্যেরই নয়, গোটা মধ্যযুগের কাব্যেই নিজের কৃতিত্বে উজ্জ্বল। কবিরা বেহুলাকে নির্ভর করেই মনসার পূজা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। সে চাঁদ ও মনসা এই উভয় কোটির যোজক চরিত্র। চাঁদ ও মনসার বিরোধকে একাধিক তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব। সম্প্রদায়গত উপাসকদের দ্বন্দ্ব তার একটি দিক। বেহুলা সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে। সে তার চারিত্র্যধর্ম নিষ্ঠা এবং একমুখী লক্ষ্য নিয়ে যে কাজ সম্পন্ন করতে পেয়েছে তার মধ্যে মানবিকবোধের একটি ভূমিকা আছে। চাঁদ বা মনসা নিজেদের দৃঢ় অবস্থান ভূমি থেকে সরে আসবার কোন জায়গা পাচ্ছিলেন না। বেহুলাকে নির্ভর করেই তাঁদের মধ্যে সেই সামঞ্জস্য স্থাপন সম্ভব হয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যে যে মানবিকতাকে এখন গুরুত্ব দেওয়া হয় তা মনে হয় আধুনিক জীবনবোধের অনুসরণে গঠিত। মধ্যযুগের জীবনভাবনায় এই মানবিকতার ক্রমোন্মোচন হওয়া সম্ভব।

মনে হয় কবিরা মনসার উপাসনা এবং পূজা প্রচারের কাহিনীকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার উদ্দেশ্যেই চাঁদের মতো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করে তার উপর বিজয়ী শক্তির প্রতিষ্ঠা করাতেই উল্লাস অনুভব করেছেন। বিশেষতঃ যে কাল পটভূমিতে এইসব দেবদেবীর পূজা প্রচারিত হয় তার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকাই ছিল প্রবলের পূজা প্রতিষ্ঠা। সেখানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রবলতা তার চন্ডশক্তিতে আবির্ভূত হয়ে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে পারাকেই পুরুষকারের স্থির আদর্শ বলে মনে করত। মনসামঙ্গল কাব্যের সমস্ত কাহিনীগত দ্বন্দ্বকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা যায় মানবিকতার চেয়ে মানবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করা এবং শেষ পর্যন্ত চাঁদের পরাজয় বর্ণনা করে তাকে মনসার পূজা করতে বাধ্য করা তাই ছিল মুখ্য অভিপ্রায়। বেহুলা চরিত্রে বাঙালী মানসিকতার সমাঞ্জস্যবোধের পরিচয় আছে।

অন্ততঃ ১১ (এগারো) জন উল্লেখযোগ্য কবি প্রাক্ চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।

ক) **প্রাক্ চৈতন্যযুগের কবি ঃ-**

১। কানা হরিদত্ত
২। নারায়ণদেব
৩। বিজয়গুপ্ত
৪। বিপ্রদাস পিপিলাই

খ) **চৈতন্যোত্তর যুগের কবি ঃ-**

১। দ্বিজবংশী দাস
২। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
৩। তন্ত্রবিভূতি
৪। জগজ্জীবন ঘোষাল
৫। ষষ্ঠীবর দত্ত
৬। জীবন মৈত্র
৭। বিষ্ণুপাল

সুকুমার সেন মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের তিনটি ধারায় বিভক্ত করেছেন। তিনি প্রথমে দুটি ধারার কথা বলে সেই দুটি ধারাকে আবার দুটি উপধারায় বিভক্ত করেন। "The Manasa Saga in vernacular poetry shows two main versions southern and northern. The southern has two subordinate versions, West Bengal and East Bengal and the Northern also two, North Bengal and Bihar."[১] এই ধারা থেকে বিহারকে বাদ দিলে আমরা পাই পূর্ববঙ্গের ধারা, পশ্চিমবঙ্গের ধারা এবং উত্তরবঙ্গের ধারা।

১। **পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ ঃ** এই ধারার কবিগণ হচ্ছেন কানা হরিদত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, দ্বিজবংশী দাস ও ষষ্ঠীবর দত্ত।

২। **পশ্চিমবঙ্গের বা রাঢ়ের মনসামঙ্গল ঃ** এই ধারার কবিগণ হচ্ছেন বিপ্রদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও বিষ্ণু পাল।

৩। **উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল ঃ** এই ধারার কবিগণ হচ্ছেন তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল ও জীবন মৈত্র। সুকুমার সেন এই ধারায় মনকর ও দুর্গাবরকে ধরেছেন কেন না তিনি উত্তরবঙ্গের ধারার সঙ্গে কামরূপের ধারাকেও ধরেছেন। যদিও মনসামঙ্গল বা যে কোন মঙ্গলকাব্যেরই একটি প্রতিষ্ঠিত আখ্যান বর্ণনারীতি ছিল এবং কবিরাও সেই রীতিকেই অনুসরণ করেছেন তবু তাদের মধ্যে কাহিনী বর্ণনার কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল। সেই স্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভর করেই এই শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী দুটি খন্ডে বিভক্ত। দেবখন্ড ও নরখন্ড।

দেবখন্ড ঃ

পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্ব, শিবের পুষ্পবাড়ী গমন, মনসার জন্ম, চন্ডীমনসা কলহ, মনসার বনবাস, সমুদ্রমন্থন, মনসার বিবাহ, বিবাহের পর জগৎকারুর মনসাকে ত্যাগ, মনসার পুত্রলাভ, অতঃপর মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচারের ইচ্ছা ইত্যাদি ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

মানবখন্ড ঃ

মনসার মর্ত্যলোকে পূজা প্রচারের জন্য এই অংশে রাখাল বালকদের সঙ্গে বিবাদ, হাসান হোসেনের সঙ্গে সংঘর্ষ, শেষে চাঁদ সদাগরের সঙ্গে সংঘর্ষ, বেহুলা লখিন্দরের বিবাহ, লখিন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু, বেহুলার অমরলোকে যাত্রা, নৃত্যদ্বারা দেবতাদের মুগ্ধ করে স্বামী ভাসুরদের প্রাণলাভ, চাঁদসদাগরকে দিয়ে মনসার পূজার ব্যবস্থা এবং শেষে পুনরায় স্বর্গে গমন ইত্যাদি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

মধ্যযুগের কবিদের সময়কাল, পুঁথির প্রামাণিকতা বা পুঁথির অনুলিপির সময় নির্ণয় করা যথেষ্ট দুঃসাধ্য ব্যাপার। দুঃসাধ্যতার অনেকগুলি কারণ আছে ঃ

ক) মধ্যযুগের কবিরা মূলতঃ হেঁয়ালির মাধ্যমে কাব্যরচনার সময় উল্লেখ করেছেন। অনেক সময় তার অর্থ উদ্ধার কঠিন হয়ে পড়ে।

খ) মধ্যযুগের কাব্যগুলি ছিল গেয় কাব্য। তাই আসরে গান করার সময় গায়কেরা নিজেদের ইচ্ছামতো কাব্যের মধ্য অংশ বিশেষের সংযোজন বা বিয়োজন করতেন।

গ) মধ্যযুগে আধুনিক কালের মতো মুদ্রণযন্ত্র না থাকায় প্রাচীন পুঁথির কোনো স্থিররূপ নির্দিষ্ট থাকত না। তাতে অনেক অনুপ্রবেশ ঘটত। অনুলিপিকারগণ অনুলিপির সময় তাতে অনেক কিছু ঢুকিয়ে দিতেন।

ঘ) এছাড়া মধ্যযুগের লিখন সমাগ্রীর অপ্রতুলতা ছিল উল্লেখ করার মতো। তুলট কাগজে ও তালপাতার উপর সোহাই কালির লেখা হরফ অল্পদিনেই বিবর্ণ হয়ে যেত। তদুপরি ছিল কীটপতঙ্গের উৎপাত। প্রায় অযত্নে রাখা পুঁথি কীটদষ্ট হয়ে স্বল্পদুঃসাধ্যতাকে জটিল দুঃসাধ্য করে তুলত।

সুতরাং মধ্যযুগের অন্যতম কাব্য মনসামঙ্গলের কবিদের পরিচয় উদ্ধার করতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন প্রামাণিক তথ্যের বাধায় হোঁচট খেতে হয়। একাজে বিভিন্ন পুঁথির সাক্ষ্য, পূর্ববর্তী সাহিত্যের ইতিহাসকারদের মতামত, নিজস্ব অনুমান ও যুক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটা নিষ্ঠাপূর্ণ রূপরেখা তৈরী করার কাজ করে নিতে হয়। আমরা মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের পরিচয় দিতে গিয়ে ধারাগত বিভাগটিকে অনুসরণ করব।

মনসামঙ্গলের পূর্ববঙ্গীয় ধারার কবিগণ

কানা হরিদত্ত ঃ

মনসামঙ্গল তথা মনসাগীতের প্রথম কবি বাখরগঞ্জ নিবাসী কানা হরিদত্ত। তাঁর আবির্ভাবকাল বা তাঁর লেখা কোন পূর্ণাঙ্গ পুঁথি আজও আবিষ্কৃত হয় নি। তাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে বিভিন্ন কাব্যসূত্রের উপর নির্ভর করতে হয়। মনসামঙ্গলের অন্য খ্যাতনামা কবি বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যের স্বপ্নাধ্যায় অংশে লিখেছেন—

মুর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত।।
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে।।
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর।।
গীতে মতি না দেহ কেহ মিছে লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল।। **(বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৫)**

এজন্য দেবী মনসা বিজয়গুপ্তকে বিশুদ্ধতর কাব্য রচনা করতে আদেশ করলেন —

মোর বোলে পুত্র তোমি হও সাবহিত
নানা ছন্দে নানা রাগে রচ মোর গীত। **(বিঃগু/পৃষ্ঠা - ৫)**

অর্থাৎ বিজয়গুপ্তের উদ্ধৃতি থেকে এটুকু অন্ততঃ বোঝা যায় হরিদত্তের তথাকথিত মিত্রাক্ষরহীন ছন্দে রচিত স্তুতিগীতি দেবীর পছন্দ ছিল না। বিজয়গুপ্ত ঐ অংশেই শেষের দিকে বলেছেন — 'হরিদত্তের যত গীত লোপ্ত পাইল এই কালে' অর্থাৎ বিজয়গুপ্তের কাব্য রচনার সময় হরিদত্তের লেখা গীতি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। এখন প্রশ্ন বিজয়গুপ্তের আমলে যদি হরিদত্তের গীত লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে কানা হরিদত্ত কখন আবির্ভূত হন। হরিদত্তের আবির্ভাব কাল নিয়ে বিতর্ক আছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন —

> বিজয়গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময়ে যে গীতি বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অন্ততঃ দুই তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং কানা হরিদত্ত মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, আমরা এরূপ অনুমান করতে পারি।[২]

কিন্তু হরিদত্ত সম্বন্ধে অন্যান্য গবেষকদের ধারণা এতটা উদার নন। আর তাঁরা তাঁকে মুসলমান অধিকারের আগে নিয়ে যাবার পক্ষপাতীও নন। সুকুমার যেন তাঁকে নিয়ে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন তাতে তাঁকে অষ্টাদশ শতকের লোক বলে তিনি মনে করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁকে একশত বছর পিছিয়ে চতুর্দশ শতাব্দীতে স্থাপন করার পক্ষপাতী। তিনি লিখেছেন —

> খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে যদি কোন কবির রচনালুপ্ত হইতে আরম্ভ করে, তবে তিনি অন্ততঃ-একশত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; অতএব হরিদত্ত খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগেই বর্তমান ছিলেন।[৩]

মুসলমান বিজয়কালের পূর্ব থেকেই এদেশে মনসার পাঁচালী প্রচলিত থাকা সম্ভব ছিল। কিন্তু মুসলমান আমলের আগে দ্বাদশ বা একাদশ শতকের এরকম কোনো কাব্য ধারার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাছাড়া এই দুই তিনশো বছরে এই পাঁচালী ঐতিহ্যেরই বা কী হল তারও কোনো খবর পাওয়া যায় না। যদি হরিদত্ত দু'তিনশো বছরের পুরানো কবি হন তাহলে নিশ্চয় তাঁর অনুসরণে আরও কোনো কোনো কবির সেই কাব্যধারায় কাব্যরচনা সম্ভব ছিল। অথচ বিজয়গুপ্ত মাত্র হরিদত্তেরই নাম করেছেন। অন্য কোনো কবির নাম করেন নি। এতে ধারণা হয় মনসা কেন্দ্রিক পাঁচালী সাহিত্য গড়ে উঠলেও তার কবিরা ছিলেন প্রতিভাহীন এবং তাঁদের সেই স্বল্প কবিত্ব সম্পন্ন পাঁচালী কাব্যের মধ্যে কেবল হরিদত্তই কিছুটা লোক মানসে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। যেহেতু তাঁর এবং বিজয়গুপ্তের মধ্যে আর কোনো কবির নাম পাওয়া যায় না তাই অনুমান করা যায় বিজয়গুপ্তের কালে হরিদত্তই পরিচিত ছিলেন এবং অন্যরা আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এ থেকে আশুতোষবাবুর অনুমান স্বীকার করে তাকে একশো বছর আগে স্থাপন করা নিতান্ত যুক্তিহীন কাজ নয়।

হরিদত্ত কি মনসামঙ্গলের কোন পূর্ণাঙ্গ পুঁথি লিখেছিলেন, না কয়েকটি মনসা চাঁদ-বেহুলা সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত কবিতা লিখেছিলেন সে সম্পর্কে পাঠকের সন্দেহের উদয় হয়। এই সংশয়ের কারণ কবির কোন পূর্ণাঙ্গ পুঁথি না পাওয়া। তাছাড়া আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন —

> সংপ্রতি মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত দিঘপাইৎ গ্রামে একখানি প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্য হইতে হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত একটি কবিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই হরিদত্ত পূর্ব্ববঙ্গের কবি ছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা। সুলেখক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার কর্তৃক হরিদত্তের এই পুঁথিখানি উদ্ধার হইয়াছে।[৪]

তাহলে বলতে হয় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত পুঁথিটি যদি পুরোপুরি কানা হরিদত্তের হতো তাহলে দীনেশ চন্দ্র প্রথমে "একখানি প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্য হইতে হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত একটি কবিতাপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে" — [৫] একথা বলতেন না। কিন্তু উক্ত মন্তব্যের পরক্ষণেই তিনি 'হরিদত্তের এই পুঁথিখানি'[৬] বলেছেন। উক্তির মধ্যে এই অসামঞ্জস্য মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে। হরিদত্ত সম্পূর্ণ পুঁথি রচনা করেছিলেন কিনা কিংবা গায়েনরা ভণিতা সংযুক্ত করে কবির রচনাকে নিজের নামে বেমালুম চাপিয়ে দিয়েছেন কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। হরিদত্তের — "ক্ষীরোদ জলে চান্দ লখাইরে ভাসাইয়া/বিস্তর করিছে বিষাদ", পদাটির —

কানা হরিদত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়।
তার অনুবন্ধ লাচাড়ীর ছন্দ
শ্রী পুরুষোত্তমে গায়। [৭]

এই অংশ থেকে বোঝা যায় যে, মনসামঙ্গল গায়েনদের মধ্যে হরিদত্তের নাম ও পরিচয় অজ্ঞাত ছিল না। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন তাঁর বহু পদ অন্যান্য কবিরা আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন —

> এই পদাটির মধ্যে বিশেষ একজন গায়েন কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া ইহার মূল রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, অকৃতজ্ঞ কত গায়েন ও কবি যে মূল রচয়িতার কত পদ নিজেরা আত্মসাৎ করিয়াছেন, বর্তমান সংকলনে উদ্ধৃত পদাটি তাহার প্রমাণ।[৮]

বিজয়গুপ্ত হরিদত্তের কাব্য সম্পর্কে যে তুচ্ছতাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য করেছেন, তা বাংলাসাহিত্যে প্রচলিত অতীত প্রশস্তিরীতির একটি বিরল ব্যতিক্রম। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বিজয়গুপ্তের এই উক্তিকে অশিষ্ট, বিদ্বেষপ্রসূত ও তথ্যতঃ অযথার্থ বলে মনে করেছেন। হরিদত্তের প্রতি বিজয়গুপ্তের নিন্দা শুধুমাত্র কবিত্বশক্তি ও আখ্যান গ্রন্থণ নৈপুণ্যের অভাবের জন্য নয়। সমস্ত উপস্থাপনরীতি, ছন্দোপতন ও গীতের দিকে আপেক্ষিক অমনোযোগও এই নিন্দার কারণ। আমাদের মনে হয় হরিদত্ত যেহেতু মঙ্গলকাব্যের আদিমরূপ, এর ব্রতকথা ও পাঁচালীর ন্যায় সংক্ষিপ্ত আকারকে প্রথম কাব্যের রূপ দেন সেহেতু তাঁর অনেক পদের বিন্যাসে কিছুটা শিথিলতা ছিল। কিন্তু তিনি পাশাপাশি এমনও অনেক পদ রচনা করেন যাতে তাঁর পান্ডিত্য ও কবিত্বশক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে —

দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঞ্চিনী।
কেশের জাত কৈল এ কালনাগিনী।।
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলি।
দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলী।।

সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর।।
পদ্মনাগে কৈল দেবির সুন্দর কিংকিণী।
বেতনাগে দিয়া কৈলা কাকলি কাঁচুলী।।
কণকনাগে কৈল কণের চাকি বলি।
বিঘতিয়া নাগে দেবির পায়ের পাশুলি।।
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের খোপনা।
সর্ব্বাঙ্গে নিকলে জার অগ্নি কণা কণা।।[৯]

মনসার সর্পসজ্জা যে নারীর সাধারণ রূপসজ্জা নয়, ইহাতে সৌন্দর্যের সঙ্গে ভয়ঙ্করের, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, বিলাসের সঙ্গে বিনাশের যোগ সাধিত হয়" [১০] তা হরিদত্ত বুঝেছিলেন। তাই উপসংহারে কবি উল্লেখ করেছেন—

অমৃত নয়ান এড়ি বিষ-নয়ানে চায়।
চন্দ্রসূর্য্য দুই তারা আড়ে লুকায়।।[১১]

অর্থাৎ যে রূপের ছটায় চন্দ্র সূর্য্যের দীপ্তিও ম্লান হয়ে যায় তার দ্যুতি ও ভীষণতা যে ভয়ঙ্কর হবে তা কবি হরিদত্ত বর্ণনা করতে ভোলেন নি।

বস্তুত পরবর্তী যুগের কবি নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্ত মঙ্গলকাব্যে বিষয় সন্নিবেশ ও রচনাশৈলী সম্বন্ধে যে এক উন্নততর আদর্শ অবলম্বন করতে পেরেছিলেন যা তাঁদের কাব্যকে তুলনায় জনগণের মনোহারী করে তুলেছিল তা আদিকবি হরিদত্তের পক্ষে সম্ভব হয় নি বলেই হরিদত্তের সঙ্গে তাঁদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশী পরিদৃষ্ট হয়েছে।

কবি নারায়ণদেব ঃ

মনসামঙ্গলের প্রাচীন কবিদের মধ্যে কানা হরিদত্তের পরেই নারায়ণদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের শুধুমাত্র একজন সুপ্রাচীন কবিই তিনি নন, এই কাব্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিও। নারায়ণদেবের কাব্য পূর্ববঙ্গের সীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অসামীয়া ভাষায় লেখা নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণের' পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। নারায়ণদেব তাঁর কাব্যে সুনির্দিষ্ট কোন সন তারিখের উল্লেখ করেন নি। আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন প্রথমে নারায়ণদেবের কাল নির্ণয় করতে গিয়ে মন্তব্য করেন, নারায়ণদেব আনুমানিক ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মনসামঙ্গল রচনা করেন। পরে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে তিনি নূতন করে সিদ্ধান্ত করেন, — "নারায়ণদের পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন এবং সম্ভবত বিজয়গুপ্তের কিছুকাল পূর্বে কাব্যরচনা করেন।"[১২]

অন্যপক্ষে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন —

> নারায়ণদেবের জীবৎকাল নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কবির কাব্য সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করা হইলে হয়ত তখন কাল নির্ণয়ের উপাদান মিলিবে। ইতিমধ্যে ষোড়শ শতকের শেষ হইতে সপ্তদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত ধরিলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম হয়। [১৩]

আবার ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য নারায়ণদেবের কুলপঞ্জী উদ্ধার করে বঙ্গবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত কবির বংশধরকে অষ্টাদশ পুরুষ ধরে এবং চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরে হিসেব করে বলেন, নারায়ণদেব সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

> নারায়ণদেবকে একজন অতি প্রাচীন কবি বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার বংশধরদিগের গৃহ হইতে তাঁহার রচিত মনসামঙ্গলের একটি পুঁথি ও একটি বংশলতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বংশলতাটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। ইহাতে দেখা যায়, নারায়ণদেব হইতে বর্তমানে অষ্টাদশ পুরুষ চলিতেছে। চারিপুরুষেও যদি এক শতাব্দী ধরা যায় (কেহ কেহ তিন পুরুষেই এক শতাব্দী ধরিয়া থাকেন) তথাপি নারায়ণদেব খৃষ্টীয় পঞ্চাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। [১৪]

কিন্তু কুলপঞ্জিকার এই হিসেব খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয় আবার ডঃ সেন যে নারায়ণদেবকে ষোড়শ শতকের শেষ থেকে সপ্তদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে ধরার কথা বলেছেন তাও যুক্তিযুক্ত নয়।

অন্যদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পাদিত নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের সম্পাদক ডঃ তমোনাশ দাশগুপ্ত কাব্যের অভ্যন্তরীণ প্রমান উদ্ধারের চেষ্টা করে নিম্নলিখিত মতামতগুলি উপস্থাপন করেছেন ঃ—

> ক) যেহেতু নারায়ণদেবের কাব্যে বৈষ্ণবপ্রভাব তেমন নেই, যা আছে তাও বিজয়গুপ্তের তুলনায় কম এবং তা গায়েনের দ্বারা অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত, তাই স্বভাবতই নারায়ণদেব চৈতন্যদেবের পূর্বে জন্মগ্রহন করেছিলেন।
>
> খ) বিজয়গুপ্তের কাব্য 'হাসান-হুসেন' পালার যে আনুপূর্বিক বর্ণনা আছে, নারায়ণদেবে তা নেই, কেবল উল্লেখ আছে মাত্র। সুতরাং তিনি অনুমান করেন — এদেশে তুর্কি আক্রমণের অব্যবহিত পরে যখন তারা সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ করে উঠতে পারে নি — সেই যুগেই নারায়ণদেব কাব্য রচনা করেছেন।
>
> গ) নারায়ণদেবের কাব্যে 'দেব-দেবীবন্দনা' 'সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা' 'দেবখন্ড' এমন কি নরখন্ডের চৌতিশা, বারমাসী, কাঁচুলী নির্মান ইত্যাদি বিষয়ে মনসামঙ্গলের প্রথাগত সংস্কার পরিলক্ষিত হয় না। সেই কারণে ডঃ দাশগুপ্ত অনুমান করেন মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য নির্মাণের আগেই নারায়ণদেব কাব্যরচনা করেন। [১৫]

নারায়ণদেবের কাল নির্ণয়ে ডঃ দাশগুপ্ত কাব্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করে যে সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছেন সেগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিলেও তা অকাট্য নয়। তবে এসব যুক্তি থেকে এটুকুই অন্ততঃ ধারণা করা যায় যে বিজয়গুপ্তের থেকে নারায়ণদেব পূর্ববর্তী ছিলেন। তবে কতদিন আগে বর্তমান ছিলেন তা বোঝা যায় না। প্রসঙ্গত একটি কথা স্মরণে আসে বিজয়গুপ্ত নিতান্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে হলেও কানা হরিদত্তের আদর্শ অনুসরণ করে কাব্য রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে কানা হরিদত্তের কাহিনী যদি লুপ্ত হয়ে গিয়েও থাকে, তবু তাঁর ঐতিহ্য আদর্শ অবলম্বন করেই বাংলাভাষার পরবর্তীকালের অন্যান্য মঙ্গলকাব্য গড়ে উঠেছিল। কিন্তু নারায়ণদেবের কাব্যের একটি পুঁথিতে আছে —

পদ্মাপুরাণের কথা শ্লোক করা আছে।
নারায়ণদেবে তারে পাঁচালী রচিতছে।।[১৬]

অর্থাৎ বিজয়গুপ্তের মতো নারায়ণদেব কোন কবির রচনাকে আদর্শ হিসেবে পান নি। অনুমান করতে হয়, কবি নারায়ণদেব যখন কাব্যরচনা করেন তখন হরিদত্তের কাব্য হয়তো রচিত হয়েছিল ঠিকই তবে সর্বাত্মক আদর্শ কাব্যরূপে ততটা প্রচার পায় নি। অতএব নারায়ণদেব হরিদত্তের অব্যবহিত পরে এবং বিজয়গুপ্তের আগে কাব্যরচনা করেন। আর তার কালটা ছিল খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদ। কেননা আমরা হরিদত্তকে চতুর্দশ শতকের শেষপাদের কবি বলেছি এবং তার কাব্য যদি ততটা প্রচার না পায় তবে সেই সময়টা নিশ্চয় কাব্যরচনার ২০-২৫ বছর পর হবে। অর্থাৎ চতুর্দশ শতকের শেষ পাদ থেকে ২০-২৫ বছর পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধই হওয়া উচিত। বাংলাদেশে নারায়ণদেবকে পঞ্চদশ শতকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা হলেও আসামে তাঁকে সপ্তদশ শতকের কবি বলে মনে করা হয়।[১৭]

নারায়ণদেবের উপর আসামের অধিবাসীরা দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও একথা জোর দিয়েই বলা যায় কবি ছিলেন পূর্ববঙ্গের নিবাসী। আত্মপরিচয় অংশে তিনি লিখিছেন —

নারায়ণ দেবে কয় জন্ম মগধ।
মিশ্রপণ্ডিত নহে ভট্ট বিশারদ।।
অতিশুদ্ধ জন্ম মোর কায়স্থের ঘর।
মৌদ্গল্য গোত্র মোর গাঁই গুণাকর।।
পিতামহ উদ্ধব নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্ষিণী মোর মাতা।।
পূর্ব পুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
রাঢ় ত্যাজিয়া মোর বোর গ্রামে বসতি।।[১৮]

(সম্ভবত এই কথার উপর নির্ভর করে দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁকে মগধ দেশ থেকে আগত বলে মনে করে ছিলেন।)

অর্থাৎ দেব উপাধিক কায়স্থ কবির পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল রাঢ়দেশ; তাঁর বৃদ্ধ পিতামহ উর্দ্ধারণদেব (উদ্ধবরাম) রাঢ়দেশ ছেড়ে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহাকুমার অন্তর্গত বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পিতা নরসিংহ, মাতা রুক্মিণী। কবিরা কায়স্থ, মৌদ্গল্য গোত্র, গুণাকর গাঞি।

কবি বিজয়গুপ্ত ঃ

নারায়ণদেবের পর মনসামঙ্গলের পরবর্তী স্মরণীয় কবি বিজয়গুপ্ত। মনসামঙ্গল কাব্যের তথা মঙ্গল কাব্যের সন-তারিখ-যুক্ত প্রাচীনতম পুঁথির লেখক একমাত্র তিনিই। পূর্ববঙ্গে এই কাব্যের জনপ্রিয়তা এত বেশী ছিল যে গায়েনদের হাতে পড়ে মূল রচনা একান্ত বিকৃত হয়ে পড়েছে এবং তার সঙ্গে অন্যকবিদের রচনা এসে মিশেছে।[১৯] এদিক থেকে মধ্যযুগের অন্যতম অনুবাদকাব্য কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের তুলনা করা যেতে পারে।[২০] ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বিজয়গুপ্তের ছাপা গ্রন্থে (প্যারীমোহন সম্পাদিত) আধুনিক শব্দ প্রয়োগ লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছেন — "বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল আমাদের কাছে যেভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা যে নিতান্ত আধুনিককালের যোজনা তাহা দেখাইবার জন্য আরও কয়েকটি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।"[২১] কিন্তু ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিজয়গুপ্তের অধিক জনপ্রিয়তা এবং কাব্যে অযথা ও অযৌক্তিক হস্তক্ষেপের কথা স্বীকার করেও তাঁকে প্রাচীন কবি বলে স্বীকার করেন। তিনি (১২৪২ -৪৪) সনের প্রাপ্ত এক পুঁথি ও প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সম্পাদিত ছাপাগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩০৮) পাঠের তুলনামূলক আলোচনায় দেখিয়েছেন যে — ছাপা গ্রন্থ ও পুঁথির পাঠে পার্থক্য থাকলেও তাকে একেবারে আধুনিক গ্রন্থ বলা যায় না।[২২] তবে প্রসঙ্গত স্বীকার করতে হয় যে বিজয়গুপ্তকে জনপ্রিয়তার মূল্য দিতে হয়েছে।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের রচনাকাল নিয়েও নানা মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর পুঁথিতে যে রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া যায় সেটিই তাঁর কাল নির্ণয়ের মূল অবলম্বন। অথচ সেই রচনা কালজ্ঞাপক শ্লোকগুলির মধ্যেও বেশ পার্থক্য দেখা যায়। পদ্মাপুরাণ গ্রন্থের সম্পাদক প্যারীমোহন দাশগুপ্ত ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। প্যারীমোহন লোক পরম্পরায় শুনেছিলেন এই কাব্য ১৪০৬ শকাব্দে রচিত হয়েছিল।[২৩] তিনি কয়েকটি পুঁথিতে যে সন তারিখের উল্লেখ পেয়েছিলেন সেগুলি হল ঃ

ক) ঋতুশশী বেদশশী শক পরিমিত। (১৪১৬ শক - ১৪৯৪ খ্রীঃ অঃ)[২৪]

খ) ছায়াশূন্য বেদশশী পরিমিত শক।
সনাতন হুসেন সাহা নৃপতি তিলক।। (১৪০০ শক - ১৪৭৮ খ্রীঃ অঃ)[২৫]

গ) ঋতুশশী বেদশশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন সাহা নৃপতি তিলক।। (১৪০৬-১৪৮৪ খ্রীঃঅঃ)[২৬]

আবার ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পুঁথিতে সন-তারিখ সংক্রান্ত —

হৃতু সিখে বেদ সসি পরিমিত সক।

সুলতান হুসন রাজা প্রিথীবি পালক।।[২৭]

এই পয়ারটি পান। অন্যদিকে নিশিকান্ত সেন কোন কোন পুঁথিতে "ছায়াশূন্য বেদশশী পরিমিত শক[২৮] অথবা 'ঋতুশশী বেদশশী পরিমিত শক'[২৯] — এই সনও পেয়েছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিজয়গুপ্তের বিভিন্ন পুঁথিতে সন তারিখের উল্লেখ আছে কিন্তু তারিখগুলির মধ্যে ঐক্য নেই। উল্লিখিত পয়ারের প্রথমটিতে ১৪১৬ শক (১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) দ্বিতীয়টিতে ১৪০০ শক (১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তৃতীয়টিতে ১৪০৬ শক (১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) পাওয়া যাচ্ছে। নিশিকান্ত সেন যে দুটি তারিখের উল্লেখ করেছেন তাতেও নানা অনৈক্য ও সংশয় আছে।

বাংলাদেশে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুসেনশাহ গৌড়ের সুলতান হয়েছিলেন। তার বছর খানেক বাদে বিজয়গুপ্ত যদি তাঁর কাব্য রচনা করে থাকেন তবে বিজয়গুপ্তের ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের কাব্য রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটির যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়। পরবর্তীকালের সম্পাদক জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ (১৯৬২) সংস্করণে যে তিনটি পুঁথি ব্যবহার করেন তাতে একটি পুঁথিতে 'ঋতুশশী বেদশশী'[৩০] পাঠ থাকায় জয়ন্তবাবুও তদ্রূপ পাঠ ব্যবহার করেন। এই পাঠ বিচারে বিজয়গুপ্তের রচনাকাল ১৪১৬ শকে (১৪৯৪-'৯৫) খ্রীষ্টাব্দে পড়ে এবং তা আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকাল। অর্থাৎ বিজয়গুপ্ত তাঁর শ্লোকে হোসেন শাহের নাম ব্যবহার করেছেন, তা যদি আলাউদ্দিন হোসেন শাহ হয়, তবে এই রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটিই প্রামাণ্য বলে স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' বইয়ে (১৪৮৪ - ৮৫) খ্রীষ্টাব্দে যে বিজয়গুপ্তের কাব্যরচিত হয়েছিল সেই মতটির পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। তাঁর মতে — ঋতু শূন্য বেদ শশী পাঠই শুদ্ধ। ১৪৮৪ - ৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ছিলেন না বটে, কিন্তু আর এক হোসেন শাহ ছিলেন। তাঁর রাজকীয় নাম জলালুদ্দিন ফতেহ শাহ। সাধারণের কাছে তিনি হোসেন শাহ নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি হুসেনশাহী নামেই মুদ্রা প্রকাশ করতেন।[৩১]

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় যদুনাথ সরকারের মত উদ্ধার করে দেখিয়েছেন —

"Most of his coins bear, after the regnal titles, the words Husain Shahi', which, like the 'Badr Shahi' of Ghiyasuddin Mahmud of the Husaini dynasty must refer to his popular name. (P. 136).

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৪০৬ শক বা ১৪৮৪ - ৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের প্রকৃত রচনাকাল এবং হোসেন সাহার উল্লেখর সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই।"[৩২]

এছাড়াও তাঁর এই মতের সপক্ষে তিনি আরো অনেকগুলি যুক্তি দিয়েছেন। তিনি মনে করেন বিজয়গুপ্তের কাব্যে হাসান হুসেন পালায় হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের যে অত্যাচারের চিত্র আছে তা এই জালালুদ্দিন ফতে শাহের কালের ঘটনা হওয়াই সম্ভব। বৃন্দাবন দাস ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে অনুরূপ সাক্ষ্য আছে। তাছাড়া বিজয়গুপ্তের বাসভূমি যে ফুল্লশ্রী গ্রাম বা 'মুলুক ফতেয়াবাদ' সেটি জলালুদ্দিন ফতেহ্ শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সেখানকার টাঁকশাল থেকে জলালুদ্দিন অনেকগুলি মুদ্রা উৎকীর্ণ করান।

তাঁর মতে, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল যদি (১৪৯৪ - ৯৫) খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়ে থাকে তবে তা হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহনের কয়েক মাসের মধ্যেই লিখিত হয়। আর তাহলে বিজয়গুপ্ত হোসেন শাহের রাজা হিসেবে যে প্রশংসা করেছেন তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। কেননা এত অল্প সময়ের মধ্যে একজন নতুন রাজার এত জনপ্রিয়তা বা রাজ্যশাসনের কুশলতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। কিন্তু বিজয়গুপ্ত (১৪৮৪-৮৫) খ্রীষ্টাব্দে কাব্যরচনা করলে এই প্রশ্ন উঠত না। কারণ জলালুদ্দিন ফতেহ্ শাহ তার কয়েকবছর আগে থাকতেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁর রাজ্যের সব অঞ্চলের লোকেরাই ইতিমধ্যে তাঁর সুশাসনের পরিচয় পেয়েছিলেন।[৩৩]

কাজেই উপরের এইসব যুক্তি অনুসারে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন — "বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল ১৪৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দেই রচিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।"[৩৪] অবশ্য সকলে এই মত যে স্বীকার করেন এমন নয়। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে জ্যোতিষ প্রমাণের উপর নির্ভর করেছেন। তাঁর মতে —

> কবির উক্তি অনুসারে মনসাপঞ্চমীর দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে রবিবারে দেবী মনসা স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া কবিকে কাব্য লিখিতে আদেশ দান করেন। জ্যোতিশ গণনানুসারে ১৪১৬ শক ২২ শ্রাবণ রবিবার কয়েকদন্ড পরে পঞ্চমী আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহার পরদিন ২৩ শ্রাবণ সোমবার কয়েকদন্ড পর্যন্ত ছিল। তাই 'জ্যোতিষ দিনচন্দ্রিকা' মতে ১৪১৬ শক কাব্য রচনাকাল হিসেবে গৃহীত হইতে পারে।[৩৫]

এইসব সাক্ষ্য বিচার করে বিজয়গুপ্তের কাল সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য ধারণায় পাওয়া যায়। প্রাচীন বা মধ্যযুগের কোনো কবির কাব্যের রচনাকাল আর বেশী নিশ্চয়াত্মকভাবে জানা যায় না। উক্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে একথা বলা যায় ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বছরের সীমার মধ্যে তাঁর কাব্যরচিত হয়েছিল।

এইটুকু জানলেই নিশ্চিত করে বলা যায় তিনি পঞ্চদশ শতকের শেষপাদের কবি।

মনসামঙ্গল কাব্যের সূচনায় বিজয়গুপ্ত যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়েছেন তার থেকে জানা যায় যে বিজয়গুপ্তের নিবাস ছিল বর্তমান পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রাম। এই গ্রামটির প্রাচীন নাম মানসী, তারপর তা ফুল্লশ্রী নামে পরিচিত হয়। গুপ্তকবির বর্ণনানুসারে এই গ্রামের পশ্চিমে ঘাঘরা নদী পূর্বে ঘন্ডেশ্বর নদ। ঘাঘরা নদী এখনও বিলের আকারে বর্তমান আছে ঘন্তেশ্বরের চিহ্নও দেখা যায়। "এই গ্রামে মনসার বাড়ী (মনসার মন্দির) এবং এই মন্দিরে পিতলের মনসামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শুনা যায়, এখানে বিজয়গুপ্ত মনসামূর্তি স্থাপন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।"[৩৬] বিজয়গুপ্ত 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে ফুল্লশ্রী গ্রামের বিস্তারিত বিবরণ দিলেও নিজের সম্বন্ধে কাব্যে 'সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত'[৩৭] এর অতিরিক্ত অন্য কোন কথা বলেন নি।

দ্বিজ বংশীদাস ঃ

কবি দ্বিজবংশীদাস ছিলেন বাংলার সুপরিচিত মহিলা কৃত্তিবাস কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। বিদুষী কন্যা তাঁর রচিত রামায়ণের অনুবাদে পিতার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে —

ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়।।
ভট্টাচার্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালার ঘর ছনের ছাউনী।।
ঘট বসাইয়া সদা পুজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায়।।
দ্বিজ বংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে।।[৩৮]

এর অতিরিক্ত কবির সম্বন্ধে প্রথমে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারে নি। দীনেশচন্দ্র সেনই তাঁর সম্বন্ধে প্রথম কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। পরে চন্দ্রকুমার দে আরো কিছু তথ্য 'সৌরভ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। দ্বিজবংশীর কাব্য সম্পাদনা করেছিলেন দ্বারকানাথ ও রামনাথ চক্রবর্তী। এই মুদ্রিত গ্রন্থে 'গোত্রাবলী' নামে একটি অংশ আছে। এই অংশে কবি নিজের বংশ পরিচয় দিয়েছেন। এই পরিচয় থেকে জানা যায় কবির পূর্বপুরুষ রাঢ়দেশ থেকে ময়মনসিংহের পাতুয়ারী গ্রামে গিয়ে বসবাস করেছিলেন —

রাড় হৈতে আসিলেন লৌহিত্যের পাশ
হাজারাদি পাতুয়ারী গ্রামেত নিবাস। (দ্বিঃব/পৃষ্ঠা - ১৩)

সেখানেই কবি জন্মগ্রহণ করেন। কবি কন্যা চন্দ্রাবতীর পরিচয় লিপি থেকে জানা যায় কবি-পরিবার

অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কারণ মনসাপূজার কারণে তাঁর পরিবার থেকে লক্ষ্মী চলে গিয়েছিলেন। কবির বাড়ী — 'বাঁশের পালায় ঘর ছনের ছাউনী'। (দ্বিঃব/পৃষ্ঠা - ১৩) আর তিনি ভাসান গেয়ে বিখ্যাত হয়ে ছিলেন। চৈতন্যের আবির্ভাবের পর যে সংকীর্তন রীতির প্রচলন হয় তিনি সেই ধারায় মনসার ভাসান গেয়ে মানুষকে মুগ্ধ করেন। কথিত আছে তাঁর গান শুনে দস্যু কেনারামের জীবনই বদলে গিয়েছিল। দ্বিজবংশীর মুদ্রিত পুস্তকে একটি কালজ্ঞাপক শ্লোক আছে —

জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার।। (দ্বিঃব/পৃষ্ঠা - ১৪)

এ থেকে বোঝা যায় কবি ১৪৯৭ শকাব্দে বা ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যরচনা করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে এই সন তারিখ অনেকে স্বীকার করেন নি। বিশেষত এই শ্লোক কোনো প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায় নি।[৩৯] আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। নানা কাব্যগত উল্লেখ ও জনশ্রুতি বিচার করে তিনি তাঁকে সপ্তদশ শতকের কবি বলে গ্রহন করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যে মগ ফিরিঙ্গির উল্লেখ বিচার করে এই যুক্তি সমর্থন করেছেন। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই সপ্তদশ শতকেই কবিকে স্থাপন করতে চান।[৪০] ডঃ সুকুমার সেন অবশ্য এই মত মানেন না।[৪১] দ্বিজবংশীর কাব্যে বৈষ্ণবতার অতিমাত্রায় উপস্থিতি লক্ষ্য করে আশুতোষ ভট্টাচার্য তাকে চৈতন্যোত্তর কালে স্থাপন করেছেন। দ্বিজবংশীর কাব্যে চাঁদ মনসার বিরোধ অনেকটাই চন্ডী মনসার বিরোধে পরিণত হয়েছে।[৪২] তিনি চাঁদ চরিত্রকে অতিশয় গুরুত্ব দিয়েছেন। চৈতন্যপূর্ব যুগে চাঁদ মনসা দ্বন্দ্ব ছিল শিব ও মনসার দ্বন্দ্ব; পুরুষ দেবতার সঙ্গে স্ত্রী দেবতার দ্বন্দ্ব। এখন তা স্ত্রীদেবতাদের কলহে রূপান্তরিত হয়েছে। দ্বিজবংশী বিমাতার সঙ্গে সপত্নী কন্যার দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। তাঁর চাঁদ চরিত্র সৃষ্টিকে আশুতোষবাবু 'অভিনব'[৪৩] বলেছেন। দ্বিজবংশী চাঁদসদাগরের দৃপ্ত পৌরুষকে বহুগুণ উজ্জ্বল করে তুলেছেন। তিনি আবার চাঁদের মধ্যে ভক্তিভাবেরও প্রকাশ ঘটিয়েছেন —

করযোড়ে ভক্তিভাবে করিলেক স্তুতি।
ব্রহ্ম স্বরূপিনী তুমি আদ্যা প্রকৃতি।।
যেই দুর্গা সেই তুমি জগতের মাতা।
অভেদ চন্ডিকা তুমি নাহিক অন্যথা।।
তোমার অনন্ত মায়া কে জানিতে পারে।
লক্ষ বলি দিয়া কালি পূজিব তোমারে।। (দ্বিঃব/পৃষ্ঠা - ১৯৩)

চন্দ্রধরের এই স্বতস্ফূর্ত উদার মনোভাব চৈতন্য পরবর্তী যুগেরই মানবিকতার সহজ অভিব্যক্তি।

কবি ষষ্ঠীবর দত্ত ঃ

শুধুমাত্র শ্রীহট্টে নারায়ণদেবের পর যে কবি সমধিক প্রচার লাভ করেছিলেন তিনি কবি ষষ্ঠীবর

দত্ত। তাঁর কাব্য শ্রীহট্টে বেশ জনপ্রিয়; মনসা পূজাদিতে আজও তা শ্রদ্ধাভরে পঠিত হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন —

> এখনও প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত গয়গড় গ্রামে ষষ্ঠীবরের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত উমা-মহেশ্বরের শিবের বাটিতে কবির বার্ষিক স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে স্থানীয় ও বিদেশাগত শিক্ষিত জনসাধারণ সমবেত হইয়া কবির জীবনী ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন।[৪৪]

স্বাভাবিক কারণেই ষষ্ঠীবরের মনসামঙ্গল বাংলাদেশে বিশেষ প্রচলিত না থাকলেও শ্রীহট্টে এর একাধিক মুদ্রণ হয়েছে। কলকাতার বটতলা থেকেও এর একটি মুদ্রিত সংস্করণ (১৩৪৫) প্রকাশিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ষষ্ঠীবরের কাব্যের কতক নির্বাচিত অংশ ১৯১৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় (১ম ভাগ, পৃষ্ঠা ২৫০-৫৭) নামক সঙ্কলন গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টের বাইরে ষষ্ঠীবরের কাব্যের বিশেষ প্রচার ছিল না। তাই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীহট্ট থেকেই কবির নামে প্রচলিত পুঁথি থেকে তাঁর সঙ্কলনের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।

ষষ্ঠীবর দত্ত কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন, কখন কাব্যরচনা করেন সে সম্বন্ধে তাঁর প্রাপ্ত রচনা থেকে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ কোন তথ্য জানার উপায় নেই। কয়েকখানি কুলপঞ্জিকা থেকে শুধু এটুকু জানা যায় যে এই শৈব কবি বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহন করেন। বল্লালসেনের আমলে তাঁর পূর্বপুরুষ রাঢ়দেশ ছেড়ে শ্রীহট্টের গয়গড় গ্রামে বসবাস শুরু করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ভুবনানন্দ, পিতামহের নাম পুরুষোত্তম, জ্যেষ্ঠভ্রাতা হৃদয়ানন্দ। কাব্যের মধ্যে কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত তিনিও কিছু পদরচনা করতেন। কাব্যে তাঁর ভণিতাও পাওয়া যায়। কবি ষষ্ঠীবরকে বৈদ্যশাস্ত্রজ্ঞ ষষ্ঠীবরের সঙ্গে এক বলে মনে করার প্রধান অবলম্বন কুলপঞ্জিকার প্রমাণ। স্থানীয় প্রবাদ থেকে জানা যায় তিনি গুণরাজ খাঁ উপাধি পেয়েছিলেন। কেউ কেউ অনুমান করেছেন তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন এসব অনুমানের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে প্রাপ্ত পুঁথির ভাষা বিচার করে ষষ্ঠীবরকে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে স্থাপন করতে চেয়েছেন। ডঃ সেনের এই উপস্থাপনার পেছনে যুক্তি আছে। কেননা শ্রীহট্ট থেকে মুদ্রিত কাব্যের ভাষাতে অত্যন্ত উৎকট আধুনিকতা প্রবেশ করেছে।

শ্রীহট্টের দত্ত গ্রাম হয় ষষ্ঠীবর ধাম
মাতৃদেবী অতি পূণ্যশীলা।।
তার গর্ভে জনমিয়া পদ্মাপুরাণ বিরচিয়া
দত্তবংশ কীর্তি প্রকাশিলা।।[৪৫]

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও এই লেখা দেখে মন্তব্য করেছেন — এই মুদ্রিত পুঁথি দুইটি আদ্যোপান্ত ষষ্ঠীবরের খাঁটি রচনা বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। উভয় পুঁথির ভাষাই অত্যন্ত আধুনিকতা প্রাপ্ত এবং তাহাদিগের মধ্যে স্থানে স্থানে অন্য কবির রচনার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। [৪৬]

তিনি আরো বলেছেন — অবশ্য অধুনা প্রচলিত ষষ্ঠবরের পদ্মাপুরাণ যেভাবে বিকৃত হইয়াছে তাহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কোন ধারণাই নির্ভুল হইতে পারে না। [৪৭]

এই কারণে ষষ্ঠীবরের আবির্ভাবকাল নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মতান্তর থেকে যাচ্ছে। বিশেষ কোন কারণে নয় কতকটা অনুমান নির্ভর করে তাঁকে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি বলার যুক্তি খুব জোরালো নয়। ষষ্ঠীবর শ্রীহট্টে বিশেষ সম্মনিত কবি কিন্তু সমগ্রবঙ্গে তাঁর সে শ্রদ্ধার আসন নেই। কবিত্ব গুণেও তাঁর কাব্য বিশেষ প্রশংসার দাবী করতে পারে না। সুকুমার সেন একটি দুটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার উপস্থাপনা দেখে তাঁর প্রশংসা করেছেন বটে কিন্তু সে সম্বন্ধে সকলে একমত হন নি। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকতাকে বিশেষ পূর্ব সূত্রের অনুকরণ বলে মনে করেন। "কাব্যটি নিতান্তই গতানুগতিক"[৪৮] তিনি এই মন্তব্য করেছেন। যাইহোক ষষ্ঠীবরের কাব্য বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যের একটি আঞ্চলিক রূপের পরিচয় দেয় বলে তাকে আমরা এই আলোচনার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। মধ্যযুগের কবিরা যে সর্বদা খুব মৌলিকতা দেখিয়েছেন বলে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছেন তা নয় বরং বর্তমান প্রসঙ্গে বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্যই তাঁকে আমরা মর্যাদা দেব।

মনসামঙ্গলের পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার কবিগণ

বিপ্রদাস পিপিলাই ঃ

চৈতন্য পূর্ববর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের যে একজন মাত্র কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন তাঁর নাম বিপ্রদাস। কলকাতার অদূরে দত্তপুকুর অঞ্চল থেকে তাঁর কাব্যের পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৮৯৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিপ্রদাসের কাব্যের দুইখানি খন্ডিত পুঁথি অবলম্বনে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 'Descriptive Catalogue of vernacular Manuscripts'(IX, 338 - 339)-এ প্রথম কবির পরিচয় ও কাব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেন। পরবর্তীকালে ডঃ সুকুমার সেনের সম্পাদনায় বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' কাব্য এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে পূর্ণাঙ্গ আকারে প্রকাশিত হয়।

কবির আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় তাঁর পিতার নাম মুকুন্দ, তাঁরা সামবেদী ব্রাহ্মণ, কৌথুম শাখা। তাঁর বাৎস্য গোত্র, পঞ্চপ্রবর, পদবী পিপিলায় বা পিপিলাই। কবিরা চার ভাই। কবির গ্রামের নাম

পাওয়া যায় 'বাদুড়্যা' আবার কোন কোন পুঁথিতে 'নাদুড়্যা'। বারাসাতের কাছে বাদুড়িয়া গ্রামে একটি বিখ্যাত ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে, আবার এই অঞ্চলে নাদুড়িয়া নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। মনে হয় এই দুই গ্রামের কোন একটিতে কবির নিবাস ছিল।

কবি বিপ্রদাস কখন আবির্ভূত হন, তা নিয়ে সাহিত্যের ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক আছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে — মনসার কাহিনী "পঞ্চদশ শতাব্দ শেষ হইবার আগেই পরিণত এবং পরিপূর্ণ কাব্যরূপ ধারণ করিয়াছিল। তাহার ইঙ্গিত বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে পাই। বিপ্রদাসের কাব্যটি রচিত হইয়াছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে।"[৪৯]

আবার কাব্য রচনাকাল সম্পর্কে কবি তাঁর গ্রন্থে যা বলেছেন —

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহীশক পরিমাণ।
নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের প্রধান।।
হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া দ্রবিত লোক পরম পিরীত। (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ৩)

তাতে ১৪১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান, তখন কবি বিপ্রদাস পদ্মার এই ব্রতগীত রচনা করেন। অর্থাৎ গ্রন্থের রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোক ও ডঃ সেনের মতামত একই।

কিন্তু অন্যদিকে কাব্যের প্রাচীনতা সম্বন্ধে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তিন ধরণের অভিযোগ করেছেন—

ক) কাব্যের কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত কোন অংশ মৌলিক তা বোঝার উপায় নেই।[৫০]

খ) চাঁদের বানিজ্য যাত্রায় এমন কতকগুলি স্থানের নাম আছে যেগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে হওয়া অসম্ভব।[৫১]

গ) পুঁথির 'ভাষা' আদ্যেপান্ত নিতান্ত আধুনিক।[৫২] এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন বহুল প্রচারের জন্য প্রাচীন কাব্যের ভাষা বদলে যায়। বিপ্রদাসের কাব্য বহুল প্রচারিত ছিল না। তা হলে কীভাবে ভাষার এরকম পরিবর্তন হল ? পুঁথিতে প্রাপ্ত রচনা কাল জ্ঞাপক শ্লোক পুঁথিতে প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্য দ্বারা সমর্থিত না হলে বিবেচনাযোগী নয়।

ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপরোক্ত যুক্তিগুলির বিশ্লেষণ মূলক উপস্থাপনা করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাইশা'র ভূমিকায় লিখেছিলেন - "মনসামঙ্গলের কোনও পদসঙ্কলন বা বাইশায় তাহার ভণিতাযুক্ত কোনও পদ পাওয়া যায় না।"[৫৩] অসিতবাবু এই যুক্তিটির বিস্তার ঘটিয়ে বলেছেন যাঁকে মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম কবি বলা হচ্ছে[৫৪] তাঁর পরিচয় শিক্ষিত সমাজে জানা ছিল না - সত্যি এটা বেশ বিস্ময়ের। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি তালিকায় তাঁর সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ করেন। যাইহোক অতঃপর ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্রদাসের কাব্যের ভাষার আধুনিকতা, অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্থান নামের উল্লেখের বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে কাব্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি যে সব আধুনিক প্রয়োগ

বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন (যেমন, ছাড়িয়া যাবে মোরে কোথা, (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ৪৫), চিন্তাকুল দুইভাই ভাবে সবিস্ময় (বিঃপি/পৃষ্ঠা - ৮৬) ইত্যাদি) সেগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। তিনি প্রশ্ন করেছেন "এই ভাষা কি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা হইতে পারে?"[৫৫] তিনি ভাষা ও ছন্দের আরও কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন। যেমন ঃ

চাঁচর প্রচুর কেশ বাঁধিল কবরী
নানা অলঙ্কার অঙ্গে মনিরত্ন ঝুরি।
চন্দন তিলক শোভে ললাটে সিন্দূর
নয়নে কজ্জল তাহে অলক প্রচুর।
দশনে মুকুতা পাঁতি জিনিয়া ভ্রমর
অমিয়া বরিখে বিম্বু জিনিয়া,অধর। [৫৬]

এই দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি লিখেছেন — "এখানে ভাষাও পয়ার এমন চাঁছা-ছোলা যে ভারতচন্দ্র-ঘনরামের কথা মনে পড়ে।"[৫৭] এছাড়া তিনি বিপ্রদাসের কাব্যে গ্রাম ও জনপদের নামের আধুকিতার কথা তুলে কাব্যটি পঞ্চদশ শতকের রচনা কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। বিশেষত নিমাইতীর্থ এবং শ্রীপাট খড়দহের উল্লেখ নিমাই ও নিত্যানন্দের আগে সম্ভব ছিল না।

বিপ্রদাসকে সুকুমার সেনই যথার্থ আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি তাঁর চারখানির পুঁথির উপর নির্ভর করে একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই পুঁথিগুলির মধ্যে হরপ্রসাদ উল্লিখিত দু'টি খন্ডিত পুঁথিও ছিল। এর সঙ্গে বর্ধমান সাহিত্যসভায় রক্ষিত একটি পুঁথির নকল এবং বিশ্বভারতী পুঁথিশালায় রক্ষিত পুঁথিটি ছাড়া অন্যান্য পুঁথিগুলি সবই খন্ডিত। সুকুমার সেন নিজেও জানতেন যে পুঁথিগুলি তিনি ব্যবহার করেছেন সেগুলি একাধিক পুঁথির মিশ্রণ। যেমন এশিয়াটিক সোসাইটির একটি পুঁথি (G 3530) সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন "These folia belonged originally to two different MSS"[৫৮] এইসব পুঁথিগুলিই দত্তপুকুর জাগুলিয়া অঞ্চল থেকে পাওয়া গিয়েছিল। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এই কবির কোন প্রচার ছিল না। সুকুমারবাবু নিজেও জানতেন এই পান্ডুলিপিগুলি অতিশয় অর্বাচীন "Very late".[৫৯] এবং এর মধ্যে বহু প্রক্ষেপ ঢুকে যাওয়া অসম্ভব নয়। "It is not unespected that there would be interpolations and Emendations."[৬০] এর ভাষার আধুনিকতা সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। খড়দার উল্লেখকে তিনি 'Obvious interpolations'[৬১] বলেছেন, কলিকাতার কথাও এই সূত্রে বিবেচনা করতে চান এবং এগুলিকে "Singer elaboration"[৬২] বলে মনে করেন। অসিতবাবু এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেন — "এই অংশটুকুকে গায়েনের প্রক্ষেপ বলিতে হইবে কেন ? এই অংশের ভাষা গ্রন্থের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা তো আধুনিক নহে।"[৬২]

এসব সত্ত্বেও অসিতবাবু গ্রন্থটিকে ষোড়শ শতকের রচনা বলে গ্রহণ করতে চান। তিনি লিখেছেন পুঁথির

ভাষা বিচার করে কাব্যটিকে ষোড়শ শতকের পূর্বে রাখা যায় না।[৬৪] এর সঙ্গে কিন্তু কাব্যোক্ত কালজ্ঞাপক পয়ারটিকে মেলানো যায় না। সে কারণে মনে হয় কালজ্ঞাপক পয়ারটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্থান নামোল্লেখ ও ভাষাকেই প্রাচীনত্ব বিচারের প্রধান উপকরণ বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কালজ্ঞাপক শ্লোকটিকে একেবারে বর্জন করা যায় না। কারণ সুকুমার সেন যে পুঁথিগুলি অবলম্বন করে এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন সেগুলিতে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'Descriptive Catalogue' রচিত হয়েছিল। তিনি যে দু'টি পুঁথির ভিত্তিতে বিপ্রদাসের পরিচয় দেন সেখানে এই শ্লোক ছিল। সেজন্য একে বর্জন করা সম্ভব নয়। অসিতবাবু এই কারণে মন্তব্য করেছেন "যে আদর্শ পুঁথি (যাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই) অবলম্বনে এই চারিখানি পুঁথি নকল করা হইয়াছিল তাহাতে যদি কালজ্ঞাপক চারিছত্র প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে কবির প্রাচীনত্বের গৌরব ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে।"[৬৫] অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কিন্তু এই শ্লোকটির প্রামাণিকতা এবং কবিরও প্রাচীনতায় আস্থাশীল। বিপ্রদাসের আখ্যানবর্ণনা কেবল চাঁদসদাগরের দ্বন্দ্বকে আশ্রয় করে হয় নি। তিনি মনসা আখ্যানের বহু বিষয়কে এই কাব্যের অঙ্গীভূত করেছেন। তিনি তাঁর মতামতে বলেছেন, — "সন্দেহের কারণ খুব যুক্তিসঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মনে হয়, বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' ১৪১৭ শকাব্দেই রচিত হয়েছিল।"[৬৬] কারণ হিসেবে তিনি যে যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন তার মধ্যে ফাঁক নেই তা নয়। তিনি বলেছেন —

(১) রচনাকালসূচক শ্লোকটিতে 'গৌড়ের প্রধান' - হুসেন শাহা অর্থাৎ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের উল্লেখ আছে। যদি ধরা যায় যে - বইটি ১৪১৭ শকাব্দে লেখা নয়, পরবর্তীকালে কোন লেখক জাল করেছিল তাহলে প্রশ্ন উঠবে এই জালিয়াৎ জানতে পারল যে ১৪১৭ শকাব্দে হোসেন শাহ 'গৌড়ের প্রধান' ছিলেন?[৬৭] প্রসঙ্গত বলা দরকার যে এই শ্লোকটি যদি আদর্শ পুঁথিতে প্রক্ষেপ হিসেবে এসে থাকে - যা অসিতবাবু সম্ভাব্য বলে ইঙ্গিত করেছেন - তাহলে এই যুক্তিতে দাঁড়ানো যায় না। যাইহোক সুখময়বাবুর দ্বিতীয়যুক্তি ঃ-

(২) বানিজ্যযাত্রার সময় চাঁদ উজানি, কাটোয়া, নদীয়া, ফুলিয়া, হাতিকান্দা, গুপ্তিপাড়া, সিঙ্গারপুর, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করে শেষে সপ্তগ্রাম নগর দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কবির কথায় চাঁদের ইচ্ছা এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে —

দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম
তথা সপ্তঋষি স্থান সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান
মোক্ষ মোক্ষ রম্যতর ধাম।[৬৮]

এরপর কবি সমৃদ্ধ সপ্তগ্রাম নগরীর বর্ণনা দিয়েছেন। সুখময়বাবু মনে করেন এই বর্ণনার মধ্যেও কিছু কিছু

প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করেছে। তাঁর প্রধান যুক্তি হল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তগ্রাম বন্দরের অবনতি ঘটতে থাকে এবং অল্পকিছুদিনের মধ্যেই তা গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ষোড়শ শতকের পর রচিত হলে বিপ্রদাসের কাব্যে সপ্তগ্রামের এই গৌরবান্বিত বর্ণনা থাকতো না। এই যুক্তিতে তিনি মনে করেন "বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে লেখা"[৬৯] — সে সময়ে সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধ নগরী ছিল এবং লোকে গঙ্গার উপর দিয়ে যাবার সময় সপ্তগ্রাম ভাল করে না দেখে যেত না।[৭০]

এই যুক্তিতে তিনি মনে করেন বিপ্রদাসের কাব্য ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫ - ৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। অবশ্য তিনি এও মনে করেন পরে তাতে বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ যুক্ত হয়েছে।[৭১]

তিনি তাঁর এই প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশের ধারণার সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে বলেছেন কবি কাব্যে সাতটি পালায় মনসা আখ্যান বলবার কথা জানিয়েছিলেন —

সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গলগীত
বিস্তারে কহিব সপ্তনিশি।[৭২]

কিন্তু কাব্যটিতে বর্তমানে তেরটি পালা দেখা যায়। মনে হয় গায়েনের প্রক্ষেপের কারণে সাতটিপালা ভেঙ্গে এই তেরটি পালায় কাব্যটি বিস্তার লাভ করেছে। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত সংস্করণে তা দেখা যায়।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছিলেন বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের প্রচার তেমন ছিল না। তাই তাতে প্রক্ষিপ্ত অংশ ঢুকবার অবকাশও কম। সেই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছেন —

> বাংলার অন্য কোন অঞ্চলে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের প্রচার না হলেও, তাঁর নিজের দেশে তার যথেষ্টই প্রচার হয়েছিল। পুরুষানুক্রমে ঐ অঞ্চলের লোকেরা বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল গান করেছে এবং তাতে রাশি রাশি প্রক্ষিপ্ত উপাদান ঢুকিয়েছে।[৭৩]

এছাড়া বিপ্রদাসের কাব্যে এমন কিছু কিছু প্রসঙ্গ এসেছে যা তাঁর প্রাচীনত্বের প্রমাণকেই সুদৃঢ় করে। তাঁর কাব্যে বর্ণিত মনসাপূজার পদ্ধতি থেকে এই কাব্যের প্রাচীনতা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষ তিথিতে নৈবেদ্য, মিষ্টান্ন, দশরকম ফল, ধূপ, প্রদীপ, জলপূর্ণ ঘট ও সিজের শাখা দিয়ে মনসাপূজার যে বিবরণ তাঁর কাব্যে রয়েছে তাতে বিদ্যাপতি রচিত 'ব্যাড়িভক্তিতরঙ্গিনী' গ্রন্থের কথায় মনে পড়ে। বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল আনুমানিক (১৩৬০ - ৭০) খ্রীষ্টাব্দ। এই বিষয় থেকে তাই অনুমান করা উচিত হবে না যে বিপ্রদাসের কাব্য পঞ্চদশ শতকে লেখা।

বিপ্রদাসের কাব্যসম্বন্ধে সুকুমার সেন একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। গোটা মধ্যযুগের সাহিত্যে এর চেয়ে আর ভালো রচনা নেই "there is never a tale more sincerely and effectively told then Vipradas's narrative."[৭৩] বিপ্রদাসের কাব্যের এই বৈশিষ্ট্য অসিতবাবুও স্বীকার করেন। "কাব্যটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে রচিত হইলে ইহা বিজয়গুপ্তের অপেক্ষা যে উৎকৃষ্টতর, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।"[৭৪] বস্তুত শুধু 'Sincerety' বা 'effectively told' বলে নয় বিপ্রদাসের কাব্যে মনসা আখ্যানের আরও বহুকথা এসে যুক্ত হওয়াতে এই কাব্যের বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। বাংলায় মনসা কথার তুলনামূলক আলোচনার পক্ষে এই কাহিনীগত বৈচিত্র্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ঃ

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি। বাংলা সাহিত্যে আরো অনেকে মনসা মঙ্গল কাব্য রচনা করলেও একমাত্র তাঁর কাব্যের কথাই এদেশের লেখকেরা জানতেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাব্য প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। এরপর ১৮৫২ খ্রীঃ এটি দ্বিতীয়বার মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে। ক্ষেমানন্দের কাব্য হয়ত এই কারণে সাধারণ্যে বেশী প্রচারলাভ করে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসকার রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২)-এ ক্ষেমানন্দের নাম করেছিলেন। এছাড়া তিনি অন্য কোনো পদ্মাপুরাণের কবি বা কাব্যের নাম করেন নি। মনে হয় পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কবিদের কথা তিনি জানতেন না। বটতলা থেকে ক্ষেমানন্দের কাব্যের কয়েকটি মুদ্রণ হয়েছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ক্ষে মানন্দের ৬৬টি পুঁথি অবলম্বনে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের সম্পাদনার ক্ষেত্রে যতীন্দ্রমোহন যে রীতি অবলম্বন করেছিলেন তা সকলে অনুমোদন করেন নি। তিনি ভিন্ন ভিন্ন পুঁথি থেকে ভিন্ন ভিন্ন পালা নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। বলা বাহুল্য এতে কোন আদর্শ পাঠ নির্ণয় করা যায় না। সুকুমার সেন তাই গবেষণার পক্ষে অনুপযোগী বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাছাড়া তিনি সম্প্রদায় বিশেষের বিরাগের ভয়ে হাসান হোসেন পালা ছাপেন নি। এটিও সম্পাদনার পক্ষে ত্রুটি বলতে হয়। তিনি এটিকে বাউলের কাঁথার সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৭৬] বর্তমানে ১৩৮৪ সালে অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেবের সম্পাদনায় কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে প্রকাশিত হয়েছে। কেতকাদাসের কাব্য বেশ জনপ্রিয় ছিল। তাঁর কাব্যের পুঁথির সংখ্যাও কম নয়। কেতকাদাসের কাব্যের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয়জ্ঞাপক একটি বিবরণী সন্নিবেশিত করেছেন। অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব অধিকন্তু তাঁদের পুঁথিতে একটি কাব্যরচনাকালবাচক শ্লোকের সন্ধান পেয়েছেন। এই সংস্করণের বিশিষ্টতার পরিচয় দিতে গিয়ে প্রকাশকের নিবেদন —

এর মধ্যে সর্বপ্রথম কাব্যটি সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং পালাগুলি যথানির্দিষ্ট ক্রমে সজ্জিত হয়েছে। তাছাড়া দুই পুঁথিতে ক্ষেমানন্দের কালবাচক একটি শ্লোক পাওয়া গিয়েছে, যেটি এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম প্রকাশিত ও আলোচিত হয়েছে।[১৭]

কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যের মধ্যে কোথাও কেতকাদাস, কোথাও ক্ষেমানন্দ এই ভণিতা দিয়েছেন। তাই এর মধ্যে কোনটি কবির প্রকৃত নাম, কোনটি মনসা সেবকের উপাধি তা নিয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন কেতকাদাসকে কবির আসল নাম বলে গ্রহণ করেছেন।[১৮] অন্যপক্ষে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন কবির নাম ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস উপাধি। তিনি নিজেকে কখনো কখনো কেতকাদাস বলে উল্লেখ করেছেন। কখনো কখনো কেবল কেতকাদাস ভণিতা ব্যবহার করেছেন। মনসার জন্ম কেয়াপাতায় তাই তাঁর নাম কেতকা। আর এজন্য কবি নিজেকে কেতকাদাস বলে উল্লেখ করেছেন। কেতকাদাসের কাব্যে পাই "কিয়া পাতে নাম তব কেতকা সুন্দরী" (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ৫) এ বিষয়ে আরো অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব তাঁদের 'প্রাক্ কথন' অংশে দেখিয়েছেন কবি বহু ক্ষেত্রেই এই ক্ষেমানন্দ নামে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁরা একটা বিশেষ সমাধানে পৌঁছেছেন এমন নয়। বরং একটা মধ্যবর্তী মীমাংসাসূত্র রচনা করেছেন। সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমরা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ নামটিই গ্রহণযোগ্য মনে করি।[১৯]

কেতকাদাসের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো সূত্র ছিল না। এতদিন পর্যন্ত কবির যে সব পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে কবির আত্মবিবরণী পাওয়া গেলেও কোনো রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া যায় নি। এই আত্মবিবরণীতে সেলিমাবাদের শাসনকর্তা বারাখাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দেখে কেতকাদাসের কাব্য রচনাকাল সম্বন্ধে একটা ধারণা করা গিয়েছিল। দীনেশচন্দ্রসেন, সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবি কেতকাদাস কাব্যরচনা করেছিলেন বলে ধারণা করেন। কিন্তু এই মতের পিছনে আত্মবিবরণীর পরোক্ষ প্রমাণ থাকলেও কোনো রচনাকাল জ্ঞাপক সন তারিখের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ছিল না। কিন্তু অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত কেতকাদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে এইরকম একটি রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া গেল। এই শ্লোকটির পরিচয় আগে কোনো পুঁথিতে কেন পাওয়া গেল না কেন এই প্রথম এরকম রচনাকালজ্ঞাপক পয়ার সম্বলিত পুঁথি লক্ষ্যগোচর হল তা বলা দুষ্কর। কেতকাদাসের ক্ষেমানন্দের অনেক পুঁথি লিখিত হয়েছিল। সেগুলির সবগুলি পূর্ণাঙ্গ পুঁথি নয়। যাইহোক এই রচনাকালজ্ঞাপক পয়ারটিকে পন্ডিতেরা স্বীকার করেছেন। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, তিনি এই শ্লোক সমন্বিত পুঁথি দেখেছেন এবং এই শ্লোকটির আবিষ্কার নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী ঘটনা।[২০] অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন —

"কেতকা দাস ক্ষেমানন্দের কাব্য রচনাকাল সম্পর্কেও পুঁথিনির্ভর একটি সুনিশ্চিত তারিখ এই গ্রন্থে সরাবরাহ করা হয়েছে।"[৮১] এই দুই অধ্যাপকের স্বীকৃতিপত্র এক্ষেত্রে মূল্যবান। এঁরা প্রাচীন পুঁথি সাহিত্যের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। এই গ্রন্থে যে সন তারিখ সম্বলিত শ্লোক পাওয়া গেল তা গ্রন্থে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। প্রথমে আত্মবিবরণী থেকে কিছু প্রয়োজনীয় সূত্র উদ্ধার করি —

ক) রণে পড়ে বারা খাঁ ঃ বিপাকে ছাড়িব গাঁঃ যুক্তি করে জননীজনক।
দিন কথ ছাড়্যা যাই ঃ তবে সে নিস্তার পাই ঃ দেয়ানে হইল বড় ঠক।।
নিজ গ্রাম ছাড়্যা যাই ঃ জগন্নাথপুর পাই ঃ হেনকালে নিশি অবসান।।
তথা তেলি লম্বোদর ঃ উতরিতে দিল ঘর ঃ চালু হাঁড়ি সিধা গুয়া পান।
রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই ঃ তাহারে ভেটিতে যাই ঃ নাম তার রায় ভারামল।
তিনি দিয়া ফুলপান ঃ আর গ্রাম পাঁচখান ঃ বসতি করিতে দিলা স্থল।। (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ৬)

শূণ্যরস বাণ শশিঃ সিয়রে মনসা আসিঃ আদেশিলা রচিতে মঙ্গল।
দেবী মনসার গীতঃ ক্ষেমানন্দ বিরচিতঃ নায়কের করিবে কুশল।। (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ৭)

এই আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় কায়স্থ বংশোদ্ভূত কবি প্রথমে বর্ধমানের অন্তর্গত বলভদ্রের তালুকে কাঁথড়া গ্রামে বাস করতেন। কবির পিতা শঙ্কর মন্ডল স্থানীয় জমিদার বারাখাঁর অধীনে কাজ করতেন। তাঁর এক কনিষ্ঠ ভাই ছিল, নাম অভিরাম। যুদ্ধে বারা খাঁ নিহত হলে কবির পিতা নূতন জমিদারের অধীনে বড় অসুবিধায় পড়েন এবং গ্রাম ছেড়ে দুই পুত্র ও পত্নীকে নিয়ে জগন্নাথপুরে উপস্থিত হন, সেখানে লম্বোদর তেলি তাঁদের আশ্রয় দেন। সেখানকার জমিদার ভারামল রায় কবির পিতাকে জমিদারী কর্মে নিয়োগ করেন। একদিন দু'ভাই জলের ধারে খড় কাটতে গিয়ে দেখেন, অন্যান্য ছেলেরা মাছ ধরছে। ক্ষেমানন্দ ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে তাদের হাঁড়ি ভরা মাছ কেড়ে নেন এবং মাছগুলি ভায়ের হাতে দিয়ে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। ছেলের দল কবিকে যৎপরোনাস্তি গালি দিয়ে প্রস্থান করে। এদিকে একাকী কবি সেই জলার ধারে দেবী বিষহরীর সাক্ষাৎ পেলেন। কবি সহসা দেখেন এক মুচিনী তাঁকে কাপড় কিনতে অনুরোধ করছে। কবির পায়ে পিঁপড়া কামড়ালে তিনি যেই নীচু হয়ে দেখতে গেছেন, অমনি মুচিনী অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণে সর্পভূষিতা মনসা আবির্ভূত হয়ে কবিকে কাব্যরচনার আদেশ দেন। এরপর কবি মনসার নির্দেশ পাওয়ার সনতারিখ সংকেতবাণীর সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন।

এই সুদীর্ঘ আত্মবিবরণীতে বারা খাঁ ও ভারামল্ল রায়ের যে নাম পাওয়া যায় তারা দু'জনেই ঐতিহাসিক ব্যাক্তি। বারা খাঁ দক্ষিণরায়ের অন্তর্গত সেলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্তা ছিলেন। এই বারা খাঁর সময় সম্বন্ধে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন — "তিনি ১৬৪০ খ্রীঃ (১৪০৭ বাং সনে) কবি কঙ্কণের পুত্র শিবরাম ভট্টাচার্যকে বিশ বিঘা মৌরসী জমি প্রদান করেন। ১৬৪০ খ্রীঃ অব্দের পরে বারাখাঁ যুদ্ধে নিহত

হন এবং তৎপর কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল বিরচিত হয়।"[৮২]

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ দলিলে বারা খাঁ ও কুতুব খাঁ দু'জনের নাম আছে। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় এই দু'জনেকে অভিন্ন বলে মনে করেন।[৮৩] তিনি আত্মবিবরণী থেকে এও সিদ্ধান্ত দেন ক্ষেমানন্দের পরিবার জন্মস্থানে নানা প্রকার গোলযোগ দেখা দেওয়ায় বিষ্ণুদাসের ভ্রাতা ভারামল্লের কাছে ভূসম্পত্তি পান। আবার এ প্রসঙ্গে কেতকাদাসের মনসামঙ্গল কাব্যের সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য গ্রন্থের সম্পাদকীয় ভূমিকায় লিখেছেন ভারামল্ল তারকেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য জমিদান করেন। কিন্তু তাঁর সুস্পষ্ট সন তারিখ জানা যায় না। কিংবদন্তী থেকে জানা যায় তিনি তোড়রমল্লের সঙ্গে বাংলায় এসেছিলেন।[৮৪] তোড়রমল্ল ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় এসেছিলেন। যদি বিষ্ণুদাস ও ভারামল্ল তখন আতি অল্প বয়সে তাঁর পিতার সঙ্গে বাংলায় আসেন তাহলে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব। সুতরাং এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোনো এক সময় কেতকাদাস কাব্যরচনা করেছিলেন মনে করা যায়। সেই সূত্রেই তাঁকে সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে স্থাপন করা হয়েছে।

আবার ডঃ সুকুমার সেন বারা খাঁর নামটি বিশ্লেষণ করে তাকে উপাধি বলেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন বারা খাঁ নামক এই ফৌজদার সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বর্তমান ছিলেন এবং কেতকাদাসও এই সময় তাঁর কাব্যরচনা করেন।[৮৫] কিন্তু সাম্প্রতিক কালে অক্ষয়কুমার কয়াল ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের দু'টি পুঁথিতে একটি কালবাচক শ্লোক আবিষ্কার করায় ক্ষেমানন্দের সময় সম্বন্ধে সংশয়ের অবসান ঘটেছে। তাঁর আবিষ্কৃত শ্লোকটি এই —

শূণ্য রস বাণ শশী শিয়রে মনসা আসি
আদেশিলা রচিতে মঙ্গল।
দেবী মনসার গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত
নায়কের করিবে কুশল। (কেঃক্ষে/পৃষ্ঠা - ৭)

এই শ্লোক অনুসারে 'শূণ্যরস বাণশশী' অর্থাৎ ১৫৬০ শকাব্দ বা (১৬৩৮ - ৩৯) খ্রীষ্টাব্দে কেতকাদাস মনসার কাছে আদেশ পান। অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব এই শ্লোকটিকে ক্ষেমানন্দের রচনাকাল বলে মনে করেছেন।[৮৬] কিন্তু স্পষ্টই কবি বলেছেন এই সময় মনসা তাঁর শিয়রে বসে তাঁকে কাব্য রচনা করতে নির্দেশ দেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় এটিকে রচনাকাল না বলে দেবীর কাছে আদেশ লাভের কাল বলে মনে করেছেন। এরপর কোন সময় কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সুখময়বাবু একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন, - বারাখাঁর জীবদশায় লিখিত ও তাঁর নামাঙ্কিত যে দানপত্রটি থেকে কবির কাল নির্ধারিত হয়েছিল তার তারিখ ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ। অন্যদিকে দেখা যায় কেতকাদাস বারা খাঁর মৃত্যুর পরে দেশ ত্যাগ

করে যান এবং এর আরো কিছুকাল পরে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব কথিত কাব্যের রচনাকাল (১৬৩৮ - ৩৯) খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হলে উভয়ের সঙ্গতি রক্ষা হয় না। এই সূত্রে সুখময়বাবু বারা খাঁর দলিলটির সন তারিখের পুনর্বিবেচনা করেছেন। ইতিপূর্বে বারা খাঁর দলিলটি ১০৪৭ বঙ্গাব্দের ১লা ফাল্গুন লিখিত বলে পড়া হয়েছিল। ১০৪৭ বঙ্গাব্দের ১লা ফাল্গুন ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের পরে গৃহত্যাগ করে নিশ্চয় (১৬৩৮-৩৯) সালের মধ্যে কাব্যরচনা করা সম্ভব নয়। সুখময় বাবু এই তারিখটির ১০৪৭ এর পরিবর্তে ১০৪১ পাঠ নির্ধারণ করেছেন। তারিখটি ১০৪১ হলে বারা খাঁর মৃত্যু ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কোনো সময় হয়, এর কিছু পরে ক্ষেমানন্দ দেশত্যাগ করে যান। তারপরে ১৬৩৮ - ৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মনসার কাছে কাব্য রচনার আদেশ পান।

আমাদেরও মনে হয় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাল নির্ণয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণই যথার্থ। ক্ষেমানন্দের কাব্যের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য (কবির ত্রিবেনী-নবদ্বীপের সমৃদ্ধির বর্ণনা বা বেহুলার যাত্রাপথের যে স্থান নামের বর্ণনা) থেকেও সপ্তদশ শতকের বাংলাদেশের চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কাজেই বলা যায়, সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কেতকাদাস তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যরচনা করেন।

বিষ্ণুপাল ঃ

কবি বিষ্ণুপাল ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের কবি। সেহাড়া গ্রামে এক ধীবরের বাড়ী থেকে তাঁর কাব্যের প্রথম পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয়। এছাড়া বর্ধমান ও বীরভূম জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর তিনটি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন প্রথম এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল কাব্যটি প্রকাশ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থটির মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন,—

> The text of Visnu Pala's Manasa Mangala as is Painted here follows the Asiatic Society's manuscript No. 4993 (Government Collection). It is the only known manuscript of the work that is presented in something like a complete form. The manuscript is very old, it seems to have been written sometime between 1775 and 1825.[৮]

তবে কোন পুঁথি থেকেই কবির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। কেবলমাত্র বীরভূম অঞ্চলের জনপ্রবাদ থেকে জানতে পারা যায় কবি জাতিতে কুম্ভকার বা কামার ছিলেন এবং তাঁর নিবাস ছিল রানীগঞ্জের নিকটবর্তী সেড়গড় পরগণার মধ্যে কোন এক গ্রামে। বীরভূম জেলা ও তার সন্নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকেদের এখনও বিশ্বাস কুম্ভকার সম্প্রদায়ের লোক মনসার বিশেষ অনুগৃহীত। কারন তাঁরাই মনসার ঘট বা মূর্তি নির্মাণ করে থাকেন। মনসার ঘট নির্মাণ করার জন্য তারা মনসাদেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন বলে সাধারণের বিশ্বাস। এই জনবিশ্বাসের মূলে যদি কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকে

(না থাকাটা অস্বাভাবিক নয়) তবে বলা যায় কবি বিষ্ণুপাল জাতিতে কুম্ভকার ছিলেন এবং তাঁর নিবাস ছিল সেহাড়া গ্রাম।

ডঃ সুকুমার সেন বিষ্ণুপালের কাব্যের পুঁথির ভাষা বিচার করে কাব্য খানিকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের লেখা বলে করেন। তিনি বিষ্ণুপালের কাব্যে ধর্মঠাকুরের শাস্ত্রের প্রভাব আছে বলে মনে করেন।[৮৮] আবার ধর্মসাহিত্যের অনুরূপ বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দেখে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও মনে করেন — "যখন রাঢ়দেশে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি ব্যাপকভাবে রচিত হইতেছিল তখনই অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল।"[৮৯] (যদিও শ্রীভট্টাচার্য মহাশয় সৃষ্টিতত্ত্বের আখ্যান পরবর্তীকালে কোন গায়েন কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হওয়াও বিচিত্র নয় বলে সন্দেহও প্রকাশ করেছেন)

আমরা জানি চণ্ডীমঙ্গল অষ্টমঙ্গলায় বিভক্ত করে আট দিনে গান করার উদ্দেশ্যে রচিত কাব্য। বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গলও চণ্ডীমঙ্গলের আদর্শে অষ্টপালায় বিভক্ত হয়ে রচিত। এজন্য বিষ্ণুপালের কাব্য 'অষ্টমঙ্গলা' গানরূপে পরিচিত। বিষ্ণুপাল পল্লীকবি। তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে উচ্চাঙ্গের নাগরিক সাহিত্যগুণ নেই। কিন্তু পল্লীর স্বভাবকবির কবিত্ব আছে। তাঁর রচনাকে আশুতোষ ভট্টাচার্য ballad ধর্মী বলেছেন। তাঁর কাব্যে রাঢ় আঞ্চলের মনসাচর্চার ও মনসাভাবনার পরিচয় আছে। কাহিনীর বৈচিত্র্যের জন্য এই কাব্যটির অলোচনা দরকার। বিশেষত লোকজীবনে মনসার নানা দেবী প্রকৃতি ও তার মঙ্গল আখ্যান কিরূপ লাভ করে তা দেখার জন্য এর মূল্য স্বীকার করতে হয়।

উত্তরবঙ্গীয় ধারার মনসামঙ্গলের কবিগণ

তন্ত্রবিভূতি ঃ

উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যধারার আর একজন কবি তন্ত্রবিভূতি। এই কবির পরিচয় আশুতোষ দাস প্রথম উদ্ধার করেন। তিনি মালদহ জেলার একটি অঞ্চল থেকে তন্ত্রবিভূতির দুটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। এই পুঁথি দুটির একটিকে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রচিত বলে মনে করা হয়েছে।[৯০] অন্যপুঁথিটি এই পুঁথির প্রতিলিপি। সেটি ১২৪৪ সালে লেখা। সুকুমার সেন এই পুঁথি অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর পরিচয় দেন। পরে আশুতোষ দাসের সম্পাদনায় গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

এই তন্ত্রবিভূতিকে সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। সুকুমারবাবু এই কবির কাব্যে উত্তরবঙ্গীয় রূপের আদর্শ[৯১] পেয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য "তাহার কাব্যকে

উত্তরবাংলার মনসামঙ্গল কাব্যের ভিত্তিস্বরূপ"[২২] বলে মত দিয়েছেন। গ্রন্থ সম্পাদক স্বয়ং আশুতোষ দাস, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সকলেই এই মত প্রতিষ্ঠা করেছেন যে উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন এবং জীবনমৈত্র তাঁর কাছে ঋণী।

কিন্তু এই কবির আবির্ভাবকাল বা কাব্যের রচনাকাল নিয়ে কেউ কোনো আলোচনা করেন নি। এই কাব্যে যে কোন রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া গেছে তাও নয়। সুতরাং কিসের ভিত্তিতে এই কবির প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা হল তা বলা যায় না। সুকুমার বাবু তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যান্য কবিদের কাল নিয়ে চুলচেরা বিচার করলেও এঁর সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। তিনি লিখেছেন তন্ত্রবিভূতি মনসামঙ্গল কাব্যের এক প্রাচীন কবি এবং সপ্তদশ শতকের কবি জগজ্জীবন তাঁর রচনাকে প্রায় আত্মসাৎ করেছেন। এই ধারণার বশে মনে হয় তন্ত্রবিভূতি জগজ্জীবনের কিছু পূর্বে কাব্যরচনা করেছিলেন। কিন্তু কতপূর্বে এ নিয়ে সুকুমার বাবু বা অসিতবাবু কোনো মন্তব্য করেন নি। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন — "আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে তন্ত্রবিভূতি বলিয়া পরিচিত একজন মনসামঙ্গল কবির আবির্ভাব হয়।"[২৩] সুকুমারবাবু সাহিত্যের ইতিহাসে বিজয়গুপ্তের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন - "কাল নির্ণয় নির্ভর করে মুখ্যত পুঁথির বয়সের উপর এবং গৌণত কবির উক্তি ও অভ্যন্তরীণ বস্তুর উপর।"[২৪] কবির উক্তি এখানে কিছু নেই। সুতরাং প্রাপ্ত পুঁথির বয়স বিচার করে (একটি পুঁথি ১৮শ শতকের) সম্ভবত তাকে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে আশুতোষবাবু স্থান দিয়েছেন। আর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খন্ড পূর্বার্ধে আলোচনা করে সুকুমার বাবু কবিকে ষোড়শ শতকে স্থাপন করার অভিপ্রায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। জগজ্জীবন তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এই সূত্র ধরে তন্ত্রবিভূতিকে সপ্তদশ শতকের আদিপর্বে ন্যস্ত করাটা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। কিন্তু ষোড়শ শতক পর্যন্ত পিছিয়ে যাবার বিশিষ্ট যুক্তি থাকা প্রয়োজন।

তন্ত্রবিভূতির কাব্য একান্তভাবে মালদহের কালিয়াচক ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানা অঞ্চলে প্রচলিত বলে আশুতোষ দাস মন্তব্য করেছেন।[২৫] কবির কাব্য এই অঞ্চলেই পাওয়া গেছে। সুতরাং কি ভাবে একদা সমগ্র উত্তরবঙ্গে তা প্রচার লাভ করেছিল এবং কেনই বা তা বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল তা বোঝা যায় না। যাই হোক তন্ত্রবিভূতিকে সুকুমারবাবু তাঁতি পরিচয়ে ভূষিত করেছেন। আর এই পরিচয়ের সম্ভাব্যতা স্বীকার করে নিয়েও 'তন্ত্র' কথাটির ব্যাখ্যা করে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে তান্ত্রিক অভিধায় অভিহিত করতেও চান।[২৬] আশুতোষ ভট্টচার্য কিন্তু তাঁর দ্বিজ পরিচয় পেয়েছেন।[২৭] পরিচয় যাইহোক তন্ত্রবিভূতি তাঁর কাব্যে রচনার মনোহারিত্ব, বৈদগ্ধ্য এবং বাণীবয়নে রচনা নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তাছাড়া তিনি কাব্যে আখ্যান বর্ণনার যে ধারা তৈরী করেছেন পরবর্তীকালে জগজ্জীবন এবং জীবনমৈত্র সেই ধারা অনুসরণ করেছেন। এই কারণে তন্ত্রবিভূতির কাব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তন্ত্রবিভূতির কাব্যের কাহিনীতে দেখি কবি

মনসার নাম দিয়েছেন 'ব্রাহ্মণী তোতল'। শিব ধর্মপূজা করবেন। ফুল তুলতে মানস সরোবরে গেলেন। তাঁর বিন্দু থেকে পদ্মার জন্ম হল। শিব তাঁকে ফুলের সাজির মধ্যে লুকিয়ে আনলেন কিন্তু দুর্গা জানতে পেরে গেলেন। মনসাকে শিব বনবাসে দিয়ে এলেন। মনসা চন্দন গাছের তলায় বসে অছেন। এমন সময় ব্রহ্মা এলেন। তিনি সাগর পারে তপস্যা করতে যাচ্ছেন। মনসা ব্রহ্মার সঙ্গে জলে নামলেন। তাঁর বসন স্থানচ্যুত হল। তাতে ব্রহ্মার বিন্দুপাত হল। সেই বিন্দু পদ্মার উদরে প্রবেশ করল। পদ্মা জাঙ্গ চিরে সেই বিন্দু বের করে দিলেন। এতে বিষের জন্ম হল। শিব সেই বিষের বিন্দুমাত্র পান করে মৃতবৎ হলেন। মনসা এসে শিবকে জীবন দান করলেন। মনসার বিবাহ হল। কিন্তু তাকে চেঙ - ব্যাঙ খেতে দেখে জগৎকারু তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। তারপর চাঁদের কাছে মনসার পূজা প্রত্যাশা এবং চাঁদের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্ব। উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাহিনীতে লখিন্দরের মামীহরণ প্রসঙ্গ অভিনব। চাঁদ এরপর লখিন্দরের বিয়ে দিলেন। মোটের উপর মনসামঙ্গল কাব্যের মূল সূত্র অনুসরণ করেও মাঝে মাঝে তন্ত্রবিভূতি কিছু বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। পরবর্তী উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের tradition তাঁর কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কবিত্বের দিক থেকেও তাঁর মর্যাদা অস্বীকার করার নয়। তাঁর "রচনাশক্তি অনেক বেশী সংহত ও ঋজুগতি।"[৯৮] ভাষাবিন্যাসে শালীনতায় লোকচরিত্র জ্ঞানে ও বাস্তব চিত্রাঙ্কনেও তিনি দক্ষ।[৯৯]

জগজ্জীবন ঘোষাল ঃ

তন্ত্রবিভূতির পর উত্তরবঙ্গীয় ধারার কবিদের মধ্যে জগজ্জীবন উল্লেখযোগ্য। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বইয়ে সর্বপ্রথম এই কবির কাব্য নিয়ে আলোচনা করেন। জলপাইগুড়ির এক স্কুলের পন্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জগজ্জীবনের এক খন্ডিত পুঁথি সংগ্রহ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, অধ্যাপক শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়কে দেখান। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেন। সেই সময় ডঃ আশুতোষ দাস মহাশয়ও জগজ্জীবনের প্রাচীনতর ও পূর্ণাঙ্গ পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। শশীভূষণ দাশগুপ্তের পরামর্শে সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডঃ আশুতোষ দাসের যুগ্ম সম্পাদনায় ডঃ দাসের পুঁথির পাঠ অবলম্বনে ১৯৬০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল প্রকাশিত হয়।

কবি জগজ্জীবন কখন আবির্ভূত হন গ্রন্থের মধ্যে কোথাও তার উল্লেখ না থাকলেও গ্রন্থমধ্যে প্রাপ্ত কিছু আত্মপরিচয়জ্ঞাপক ভণিতা থেকে মোটামুটি কবির পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মপরিচয়সূচক ভণিতাগুলি হল এরূপ ঃ

এ উল্লেখ থেকে তাঁর দারিদ্র্যের ও ভিক্ষোপজীবিতার কথা পাওয়া যায়। একদা দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি প্রচলিত ছিল। সুতরাং সে হিসেবে এই কথার আক্ষরিক মূল্য থাকা সম্ভব। কবি বলেছেন তাঁকে জমিদারের বিবাহের সময় বেগার খাটতে ডাকা হয়েছিল। কবি কোনক্রমে ঘুমের ভান করে পরিত্রাণ পান। এ থেকেও তাঁর দারিদ্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময় তাঁর পূর্বপুরুষগণ সম্মানিত ছিলেন[১০৪] কিন্তু কোনো কারণে তাঁর জীবনে সে সব স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। কবি নিজের পিতামহ ও পিতার পরিচয় দিয়েছেন। সেখান থেকে জানতে পারি কবির পিতামহ ছিলেন শ্রীবংশীবদন মৈত্র। তাঁর পিতার নাম অনন্তনন্দন চৌধুরী। তাঁর মাতার নাম স্বর্ণমালা। তাঁরা পাঁচ ভাই। কবি তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন

শ্রী কবিভূষণ নাম বাস লাহিড়ী পাড়া গ্রাম

জীবন মৈত্র চতুর্থের কনিষ্ঠ।[১০৫]

কবি নাটোরের রানী ভবানীর পুত্র রামকৃষ্ণের রাজ্যের প্রজা ছিলেন।

যে সতী পুণ্যবতী রানী ভবানী।
মহারানী বলি তরে ভুবনে বাখানি।।
যার পুত্র রামকৃষ্ণ রাজা রাজ্যেশ্বর।
অপার মহিমা যশ ভুবনে যাহার।।
তাহার রাজ্যেত বাস ভিক্ষা করি খাই।
কহে কবি জীবনমৈত্র নির্দয় গোঁসাই।।[১০৬]

কবি নিজের কাব্য রচনাকাল সম্বন্ধে যে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য।

মহীপৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণ বিষ্ণু সমর্পিয়া

বুঝহ সনের পরিমান।[১০৭]

এখান থেকে বোঝা যায় কবি ১১৫১ সনে বা ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির কাব্য রচনাকালের আরো দু'টি প্রহেলিকাময় শ্লোক আছে।

অম্বুজের পৃষ্ঠে রস ঋতু রিপুদান।
এই শকে জীবন মৈত্র কবিগণ।।[১০৮]

এই উল্লেখ থেকে ১৬৬৬ শকাব্দ পাওয়া যায়। তা থেকে ১৭৪৪ খ্রীঃ পাওয়া যায়। দু'টি উল্লেখই একই কালের কথা বলে। রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়ও অনুমান করা হয়েছিল এই কাব্য পলাশীযুদ্ধের ৯/১০ বছর আগে রচিত হয়েছিল।[১০৯] জীবনমৈত্রের কাব্যরচনাকালের আরেকটি উল্লেখ —

নিরবধি সুত পৃষ্ঠে মহি আরোপিয়া।
বিরোচিত সুতের সুত তাহাতে স্থান পায়া।।
কোকনদ বন্ধুভাব পৃষ্ঠে অধিষ্ঠান।
ঐ সনে শ্রী মৈত্র জীবন রচে গান।।[১১০]

জীবন মৈত্রের কাব্য বেশ বড়। কাব্যটি দেবখন্ড ও বণিকখন্ডে বিভক্ত। কবির কাব্যটির মধ্যে কিন্তু নতুনত্ব আছে। এতে সন্নিবিষ্ট ঊষা হরণের বৃত্তান্ত স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রকাব্য হিসেবে পরিচিত হয়েছিল। জীবন মৈত্রের কাব্যে বেহুলার নাম বেলালি তার মায়ের নাম মেনকা, এবং বাবা বাহো সদাগর। আশুতোষ ভট্টাচার্য এই প্রকার বৈচিত্র্যের কারণ হিসেবে বিহারে প্রচলিত কাহিনীর সম্ভাব্য প্রভাবের ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর কাব্যের মধ্যে বহু অশ্লীল অংশ আছে।[১১১] এর কারণ হিসেবে তিনি সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব লক্ষ করেছেন। কখনো কখনো এই সংস্কৃত্ প্রভাব কাব্যে নীরস পান্ডিত্যের প্রদর্শন স্বরূপ হয়ে পড়েছে। আশুতোষ ভট্টচার্য বলেছেন তাঁর কাব্য অনাবশ্যক ও অবান্তর রচনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। জীবনমৈত্রের কাব্যে পূর্ববর্তী কবি জগজ্জীবনের প্রভাব পড়েছে বলে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন।

সূত্র নির্দেশিকা

১। Sen Sukumar, Vipradasa's Manasa-Vijaya, Introduction, Page - IX

২। সেন শ্রী দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১ পৃষ্ঠা - ১৯৩

৩। ভট্টাচার্য শ্রী আশুতোষ, বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, পৃষ্ঠা - ১।। ২/০

৪। সেন শ্রী দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা - ১৯৩

৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯৩

৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯৩

৭। ভট্টাচার্য শ্রী আশুতোষ, বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, পৃষ্ঠা - ১।। ২/০

৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৸০

৯। সেন শ্রী দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা - ১৯৩

১০। ভট্টাচার্য শ্রী আশুতোষ, বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, পৃষ্ঠা - ১৸০

১১। সেন শ্রী দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা - ১৯৩

১২। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০১

১৩। সেন শ্রী সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, পূর্বার্ধ, পৃষ্ঠা - ২৩৫

১৪। ভট্টাচার্য শ্রী আশুতোষ, বাইশা, পৃষ্ঠা - ১৸৶০

১৫। দাশগুপ্ত শ্রী তমোনাশ চন্দ্র; সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ (মনসামঙ্গল) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা

১৬। চৌধুরী শ্রী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭৩, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-২০৫

১৭। শর্মা নবীনচন্দ্র, পদ্মাপুরাণ সম্পাদিত, বাণীপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, গুয়াহাটী, ১৯৯৩ পৃষ্ঠা - ৩৫৭

১৮। ভট্টাচার্য শ্রী আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলাকব্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৩০৬

১৯। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড ঃ চৈতন্যযুগ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা -৭৩, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা - ৯০

২০। মুখোপাধ্যায় সুখময়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ভারতী বুক স্টল, প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রোতা ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা - ৯, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা - ১

২১। সেন শ্রী সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, পূর্বার্ধ, পৃষ্ঠা - ২৫৮

২২। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫

২৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৬

২৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৬

২৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৬

২৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৬

২৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৬

২৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৬

২৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৬

৩০। দাশগুপ্ত শ্রী জয়ন্তকুমার, কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২ পৃষ্ঠা - ৸৹

৩১। মুখোপাধ্যায় সুখময়, মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, পৃষ্ঠা - ২

৩২। তদেব, পৃষ্ঠা - ২

৩৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩

৩৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩

৩৫। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা - ৯৭

৩৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৮

৩৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৮

৩৮। ভট্টচার্য শ্রী আশুতোষ, বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, ভূমিকা, পৃষ্ঠা - ২৸৹

৩৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৷৷৵৹

৪০। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয়খন্ড, প্রথম পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩, পৃষ্ঠা - ৭২

৪১। সেন শ্রী সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯ ১৪০৫, পৃষ্ঠা - ২৪১

৪২। ভট্টাচার্য শ্রী আশুতোষ, বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, পৃষ্ঠা - ২৷৷৵৹

৪৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৸৹

৪৪। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৩৮৮

৪৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৯২

৪৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৯৮

৪৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪০৩

৪৮। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা - ১২৩

৪৯। সেন শ্রী সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, পূর্বার্ধ, পৃষ্ঠা - ১৮৭

৫০। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৩৪৫

৫১। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৪৬

৫২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৪৬

৫৩। ভট্টাচার্য শ্রী আশুতোষ, বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, পৃষ্ঠা - 211.

৫৪। সেন শ্রী সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, পূর্বার্ধ, পৃষ্ঠা - ১৯০

৫৫। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা - ১০৭

৫৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৭

৫৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৭

৫৮। Sen Sukumar, Vipradasa's Manasa-Vijaya, Introduction, Page - I

৫৯। তদেব, পৃষ্ঠা - IV

৬০। তদেব, পৃষ্ঠা - IV

৬১। তদেব, পৃষ্ঠা - V

৭২। তদেব, পৃষ্ঠা - V

৬৩। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ডঃ, পৃষ্ঠা - ১০৯

৬৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ১১০

৬৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ১১১

৬৬। মুখোপাধ্যায় সুখময়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, পৃষ্ঠা - ৬

৬৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ৬

৬৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭

৬৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭

৭০। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭

৭১। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭

৭২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭

৭৩। তদেব, পৃষ্ঠা - (৭-৮)

৭৪। Sen Sukumar, Vipradasa's Manasa - Vijaya, Introduction, Page - V

৭৫। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা - ১১১

৭৬। সেন শ্রী সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৯, পৃষ্ঠা - ২৪৯, পাদটীকা - ১

৭৭। কয়াল অক্ষয়কুমার ও দেব চিত্রা সম্পাদিত, মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত, লেখাপড়া, কলিকাতা, ১৩৮৪, প্রকাশকের নিবেদন অংশ।

৭৮। সেন সুকুমার, বাঙ্গাল্লা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কল-৯, ২০০০, পৃষ্ঠা - ২২৩

৭৯। কয়াল অক্ষয় কুমার ও দেব চিত্রা সম্পাদিত, মনসামঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত, পৃষ্ঠা - ২৩

৮০। তদেব, পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা - ৩২২

৮১। তদেব, পৃষ্ঠা (৬-৭)

৮২। সেন দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২২

৮৩। মুখোপাধ্যায় সুখময়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, পৃষ্ঠা - ২৪২

৮৪। ভট্টাচার্য শ্রী যতীন্দ্রমোহন সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল, প্রথম খন্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩, পৃষ্ঠা - (১৪ - ১৫)

৮৫। সেন শ্রী সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা - ২২৬

৮৬। কয়াল অক্ষয়কুমার ও দেব চিত্রা সম্পাদিত, মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত, প্রাক্ কথন পৃষ্ঠা - ১৪

৮৭। Sen Sukumar VISNUPALAS MANASA MANGALA, The siatic society, 1 Park Street Cal - 16, 1968 Forward Page - 1

৮৮। সেন শ্রী সুকুমার, বাঙ্গালো সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা - ২৩০

৮৯। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৪১১

৯০। সেন শ্রীসুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, পাদটীকা, পৃষ্ঠা - ২৪১

৯১। তদেব, পৃষ্ঠা ২৪১

৯২। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৩৬৪

৯৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৩৬৪

৯৪। সেন শ্রী সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, পূর্বার্ধ, পৃষ্ঠা - ২৪৮

৯৫। ভট্টচার্য শ্রী সুরেশচন্দ্র ও দাস ডঃ আশুতোষ, কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা - ১

৯৬। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খন্ড , প্রথম পর্ব, পৃষ্ঠা - ১০৬

৯৭। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৩৬৪

৯৮। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয়খন্ড , প্রথম পর্ব, পৃষ্ঠা - ১০৫

৯৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৫

১০০। ভট্টাচার্য শ্রী সুরেশচন্দ্র ও দাস ডঃ আশুতোষ, কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা - ১

১০১। সেন শ্রী সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা - ২৪৩

১০২। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয়খন্ড, প্রথম পর্ব, পাদটীকা নং - ৬৫, পৃষ্ঠা - ১১২

১০৩। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয়খন্ড, দ্বিতীয় পর্ব, পৃষ্ঠা - ৪৫

১০৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৬

১০৫। ভট্টাচার্য আশুতোষ; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৪০৭

১০৬। তদেব, পৃষ্ঠা-৪০৭

১০৭। তদেব, পৃষ্ঠা-৪০৭

১০৮। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খন্ড , দ্বিতীয় পর্ব, পৃষ্ঠা - ৪৭

১০৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৭

১১০। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৭

১১১। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৪০৯